# দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি

শ্যামল চক্রবর্তী

3·7
H35

# দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি

শ্যামল চক্রবর্তী

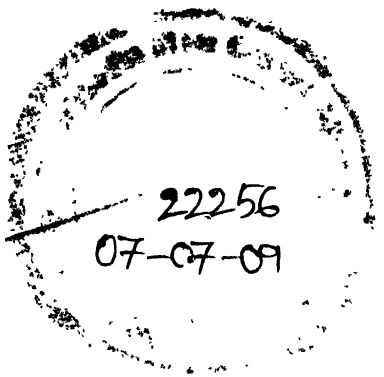


জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - 799 001

*Damodar Dharmananda Kosambi*
*By :* Syamal Chakrabarti

[redacted] প্রথম প্রকাশ
আগরতলা বইমেলা, মার্চ 2008

211378
211378

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - 799001
ফোন ঃ (0381) 232 6342 / 232 3781

মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্
294/2/1 এ পি সি রোড
কলকাতা - 700 009

অক্ষর বিন্যাস
স্বপন আড়ু

অলংকরণ
সন্দীপ দাশ

সার্বিক যোগাযোগ
জ্ঞান বিচিত্রা কার্যালয়
11, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা -799001, ত্রিপুরা
ফোন ঃ (0381) 232 3781 / 232 6342
e-mail : jnanbichitra@yahoo.com

**ISBN : 978-81-8266-138-7**

একশো টাকা

সকল বন্ধুদের

*যাঁরা সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেন*

# *লেখকের কথা*

জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় একই মানুষ উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, এমন দ্যুতিময় চরিত্র পৃথিবীতে দিন দিন কমে আসছে। একশো বছর আগে আমাদের দেশেই আমরা তেমন একজন মানুষকে পেয়েছিলাম। তিনি দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক, বিশিষ্ট গণিতবেত্তা ও বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ ছিলেন তিনি। কার্ল মার্ক্স-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তাঁর জীবন দর্শন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যকে তিনি এই দর্শনের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। আন্দ্রে ভাইল, নর্বার্ট ভাইনার, জন ডেসমন্ড বার্নাল, ড্যানিয়েল ইনগল্‌স্ প্রমুখ বিশ্বসেরা মানুষেরা ছিলেন তাঁর নিবিড় বন্ধু। মানুষটি পৃথিবীর একাধিক ভাষা জানতেন।

ভাবতে ভাল লাগে, ১৯৫৪ সালে বার্নাল যে ধ্রুপদী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি', বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণে এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুধাবনে তিনি কোসাম্বিকে অনুসরণ করেছেন।

তাঁর অধীত বিদ্যার অনেক কক্ষে আমার প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা নেই। তাঁর শৈশব, শিক্ষা, কাজ ও সর্বোপরি জীবনবীক্ষা আমাকে এই জীবনীগ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছে। আমার পরিকল্পনা জেনে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জাগিয়ে রেখেছিলেন অনেকেই। একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। তিনি গৌতম দাশ। আমার অগ্রজপ্রতিম, গণ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গৌতমদা ২০০৭ সালের 'আগরতলা বইমেলা'য় আলাপচারিতার ফাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'ডি. ডি. কোসাম্বির উপর তুমি একটা বই লিখতে পার না? বেশি বড় নয়। সকলের বোঝার মত করে।'

এই বই লেখায় অনেকে আমায় সহায়তা করেছেন। স্নেহাস্পদ সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় (সমু) পুনের ফার্গুসন কলেজ থেকে তথ্যাদি পেতে সাহায্য করেছে। আমার অনুজ সহকর্মী ড. দেবাশিস সরকারের কাছে প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছি। 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার সম্পাদক সুবল সামন্তের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা পেয়েছিলাম। তাঁকেও এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশক অঞ্জনা ও দেবানন্দ দামের কথা কী বলব?

তালগাছ
এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে

আরও ছাড়িয়ে যাক। ঝড়ে যেন কখনও ভেঙ্গে না পড়ে।

অক্ষর বিন্যাসে স্বপন আড়ুকে পেলে আমার দুশ্চিন্তা বহুগুণ লাঘব হয়ে যায়।

*জাতীয় বিজ্ঞান দিবস*
২৮.০২.২০০৮

শ্যামল চক্রবর্তী

## আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

*বিস্ময় বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং*
*নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা*
*বিজ্ঞান সময় স্বস্তি সংকট*
*দশ বিজ্ঞানীর উপাখ্যান*
*বিজ্ঞানের রঙ বেরঙ জীবন*
*যে আবিষ্কার পৃথিবী বদলায়*
*বিজ্ঞানের সেরা দশ*
*বড়ো বিজ্ঞানীর ছোটোবেলা বড়োবেলা*
*শতবর্ষে শচীন দেববর্মণ*
*মাহুত বন্ধু রে- প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডের জীবন ও গান*
*ইতিহাস আছে সকলের-ই*

## সূচিপত্র

পরিবার পরিচয় : পিতা ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি / ১১
শৈশব কৈশোর : পুত্র দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি / ২৬
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন / ৩৯
বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমাজ : কোসাম্বির চিন্তাসূত্র / ৫১
ডি ডি কোসাম্বি ও ড্যানিয়েল ইনগল্‌স্‌ / ৬৪
চেনা মানুষের চোখে ডি ডি কোসাম্বি / ৭৭
কোসাম্বির বইপত্র : প্রাথমিক পরিচিতি / ৮০
একটি ধ্রুপদী গ্রন্থের সমালোচনা / ১০০
কন্যা মীরা কোসাম্বি / ১০৪
নির্বাচিত রচনা / ১০৬
'নন্দীর পিঠে কুঁজ' : কোসাম্বির ছোটোগল্প / ১২২
ডি ডি কোসাম্বির রচনাপঞ্জি / ১৩০
জীবনপঞ্জি / ১৪৩

# পরিবার পরিচয় : পিতা ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি

'A man lives not only his personal life, as an individual, but also, consciously or unconsciously, the life of his epoch and his contemporaries'. *–Thomas Mann*

সুসাহিত্যিক ও বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের পুরোধা চরিত্র টমাস মান ব্যক্তি মানুষের বেঁচে থাকা নিয়ে উপরের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এই অভিমত যে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়, পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন। যে সকল মানুষের জন্য কথাটি একশোভাগ প্রযোজ্য, দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অতিশয়োক্তি হবে না, যদি আমরা বলি, তিনি শুধু তাঁর যুগ ও সমকালে বাস করেছিলেন তাই নয়, যুগ ও সমকালকে প্রভাবিতও করতে পেরেছিলেন। বলা যায় এমন কথাও, নিজের যুগ ও সমকালকে তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি-র বাবার নাম ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি। ছোট করে লিখলে দু'জনকেই ডি ডি কোসাম্বি হিসেবে লেখা যায়। তবে বাবা এই নামে পরিচিত নন। ছেলে তাঁর পুরো নামের চেয়ে ছোট নামেই বেশি পরিচিত।

একথা সকলেই জানেন, সন্তানের উপর বাবা-মায়ের প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। কারও কারও বেলায় এই প্রভাব এমন, বাবার জীবনধারা অনুসরণ করে আমরা সন্তানের বড় হওয়া ব্যাখ্যা করতে পারি। ব্যতিক্রম তো থাকেই। ব্যতিক্রমের কথায় যাব না। স্বাভাবিক যে গতিপথ, সে পথেই হাঁটব।

বাবা ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বির কথা না বলে আমরা ডি ডি কোসাম্বির কথায় যেতে পারব না। শুরুতে তাই বাবার জীবনকথা নাতিদীর্ঘ পরিসরে পেশ করব।

গোয়ার এক ব্রাহ্মণ পরিবার। লেখাপড়ার প্রচলন ছিল পরিবারে। অর্থকড়ির প্রাচুর্য ছিল না। ১৮৭৬ সালে এমন-ই এক পরিবারে ধর্মানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

ছোটবেলায় প্রায় সময় তিনি নানারকম অসুখে ভুগতেন। মেধাবী ছিলেন খুব। পঞ্চম মান পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাঁর বাবা পরিবারের বোঝা সামলাতে পারছিলেন না। পড়াশুনো তাই ছেড়ে দিতে হল তাঁকে। সংসারের কাজে সহায়তা করতে হল।

তখন সমাজে কম বয়সে বিয়ের প্রথা ছিল। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ধর্মানন্দ সংসার জীবন শুরু করেন। বলা ভাল, বাবার নির্দেশে শুরু করতে বাধ্য হন। গোয়ার সে সময়কার সমাজ কেমন ছিল? জাতপাতের ভেদাভেদ তীব্র। ধর্মের প্রাবল্য ছিল। বিস্ময়ের, ধর্মানন্দের মনে সে সকল ভাবনা কখনো স্থান পায়নি।

হাতের কাছে যা বই পেতেন ধর্মানন্দ গোগ্রাসে পড়তেন। বাছবিচার করতেন না। কী কাজ করতেন তিনি? নারকেল চারা তৈরি করে নিয়মিত তার দেখাশোনা করতেন। তারপর অপেক্ষা করতেন, কবে এইসব চারা থেকে গাছ হবে। নারকেলের ফলন হবে। দু'চার দিনে তো এই কাজ হয় না। বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। দিনের পর দিন এই কাজ করতে তাঁর একটুও ভাল লাগত না। একদিন হাতের কাছে সন্ত তুলারামের একটি জীবনী পেয়ে যান। তুলারামের লেখা একটি কবিতা সংগ্রহ তাঁর হাতে আসে। দিন কয় পর ছোটদের উপযোগী একটি বুদ্ধদেবের জীবনী পড়ার সুযোগ হয়। এসব বই পড়ে তাঁর মনে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঈশ্বরচিন্তা ভেসে ওঠে মনে। পার্থিব চিন্তা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। সংসার জীবনে নিরাসক্তি দেখা দেয়।

তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে কিছু প্রগতি সাহিত্য পড়তে দেন। ধর্ম সংস্কার বিষয়ে সংসারী থাকবেন না কি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আগরকারের লেখা পড়ে অস্থিরতার ভাব খানিকটা কেটে গিয়েছিল। ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করলে চলবে না, বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মানন্দ। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার পড়ার ইচ্ছে হল খুব। পড়বেন কেমন করে? সংস্কৃত ভালভাবে রপ্ত হয়নি। বুদ্ধদেবের বাণীর মর্মকথা গভীরভাবে জানতে চাইছেন। বুঝতে চাইছেন। একবার নয়, দুবার নয়, তিন তিনবার তিনি এর জন্য গোয়া ছেড়ে বাইরে চলে যান। প্রথমবার কোলাপুর গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার গোকর্ণ ও তৃতীয়বার ম্যাঙ্গালোর গিয়েছিলেন। প্রতি জায়গায় কয়েকদিন থেকে বাড়ির কথা মনে হতো তাঁর। তখন বাড়িতে ফিরে আসতেন।

১৮৯৮ সালে ধর্মানন্দের পিতা দামোদর শেনয় প্রয়াত হন। ধর্মানন্দের বয়স তখন বাইশ বছর। পিতার চিরবিয়োগের পর তাঁর মনে হল, তিনি অনেক বেশি মুক্ত। এবার বেরিয়ে পড়লে বাধা দেবার কেউ নেই। পরের বছর ধর্মানন্দ এক কন্যাসন্তান লাভ করেন। ধর্মানন্দের প্রথম সন্তান। আশ্চর্য, মেয়ের বয়স যখন মাত্র একমাস, ধর্মানন্দ আবার সংসার ত্যাগ করলেন। এবার দীর্ঘ সাত বছর তিনি বাড়ির বাইরে রইলেন।

লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায়, ধর্মানন্দ ঠিক সে ভাবেই বেরিয়েছিলেন। লোটাকম্বল আর সামান্য পরিমাণ অর্থ নিয়ে তিনি গৃহত্যাগী হলেন। পুনে গেলেন প্রথমে। সেখানে রয়েছেন ডক্টর ভাণ্ডারকার। সাধুসন্ত নন তিনি। সংস্কৃত  সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। 'প্রার্থনা সমাজ'-এর সভ্য ছিলেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রার্থনা সমাজের তুলনা করা যেতে পারে। হিন্দু সমাজের অচল অনড় প্রথা ও অগণন ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বাংলাদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্রার্থনা সমাজ'-এর ইতিহাসও অনেকটা তাই।

ডক্টর ভান্ডারকারের কাছে গিয়ে বললেন ধর্মানন্দ, 'আপনি আমাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিন'। সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে চাইছেন ধর্মানন্দ। ভাণ্ডারকার যেন সহায়তা করেন। ভাণ্ডারকার রাজি হয়ে যান। মনে সুপ্ত বাসনা, ধর্মানন্দকে তিনি প্রার্থনা সমাজের আদর্শ প্রচারের কাজে নিয়োগ করবেন। কথাটা তুলতেই ধর্মানন্দ বলেছিলেন, 'আগে সংস্কৃত শিখি, তারপর কী কাজ করব, ভেবে দেখব।'

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জানতে চাইলে ভারত তার উপযুক্ত স্থান নয়। নেপাল নয়তো শ্রীলঙ্কায় যেতে হবে। ভাণ্ডারকারের সান্নিধ্য ধর্মানন্দের স্বস্তিকর মনে হয়নি। তিনি পুনে থেকে গোয়ালিয়র হয়ে কাশী যান। পুরোপুরি নিঃস্ব তিনি। কাশীতে তাঁকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধর্মানন্দ। যে করেই হোক, সংস্কৃত শিখবেন।

দেড় বছর ধরে তিনি সংস্কৃত পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। তারপর কাশী ছেড়ে এসে পালিভাষা শেখার আগ্রহে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ সফর করেন। সাধারণ মানুষেরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন তার জন্য বুদ্ধদেব পালিভাষায় তাঁর

উপদেশ দান করেছিলেন। সাধারণের ভাষা এই পালিভাষা। বৌদ্ধভিক্ষুদের কেউ কেউ পরে সংস্কৃতে শিক্ষাদান করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সাহিত্য আমরা তাই সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষাতেই রচিত দেখতে পাই। কিছু সাহিত্য শুধু পালিভাষাতেই লেখা। সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ হয়নি। ভারতে যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছে তখন পালিভাষাতেই হয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশে পালিভাষায় লেখা অনেক বৌদ্ধসাহিত্য বিভিন্ন বৌদ্ধমঠ ও সংগ্রহশালায় দেখা যায়। সংস্কৃতভাষা শেখার পর ধর্মানন্দ পালিভাষা শিখেছিলেন। সংস্কৃত ও পালি এই উভয় ভাষা ভাল করে শিখে ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় এসে থিতু হননি। ওইসময় তিনি ধর্মীয় প্রথা মেনে বৌদ্ধভিক্ষু হয়েছিলেন। বাড়িতে স্ত্রী ও কন্যা রয়েছে। ভিক্ষুর বেশ ধারণ করতে কি তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি?

যাই হোক, কলকাতা থেকে বেরিয়ে তিনি বৌদ্ধদের তীর্থস্থানগুলি পরপর ঘুরে বেড়ান। প্রথমে কুশিনারা যান। তারপর বুধগয়া, রাজগীর, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু ও লুম্বিজীবন পরিদর্শন করেন।

পুরো দু'বছর তিনি নানা জায়গায় ঘুরে কাটান। ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে আবার কলকাতায় ফেরেন। তখন ধর্মানন্দের তিরিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

পালি ও সংস্কৃত তো ছিলই। শ্রীলঙ্কায় থাকার সময় ধর্মানন্দ ইংরেজি ভাষাও চর্চা করেন। একটা সময়ে তাঁর মনে হল, বৌদ্ধধর্ম ও পালিভাষার হৃত গরিমা পুনরুদ্ধার করবেন তিনি। ভারতে নতুন করে প্রচার করবেন। ভিক্ষা চেয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে ভিক্ষুর দৈনন্দিন জীবনযাপন তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি ভিক্ষুবেশ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ধর্ম ও ভাষা চর্চার কাজ পুরোদমে চলতে থাকে।

কোথা থেকে কাজ শুরু করবেন?

পুনে শহরে ডক্টর ভাণ্ডারকারের কাছে গিয়ে একসময় এই জীবন শুরু করেছিলেন। ভাবছিলেন, পুনেতেই যাবেন। ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে হরিনাথ দে-র দেখা হয়। শিক্ষিত বাঙালিমাত্রই হরিনাথ দে-র নাম শুনেছেন। ১৮৭৭ সালে চব্বিশ পরগণার আড়িয়াদহে তাঁর জন্ম। বয়সে ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বির চেয়ে এক বছরের ছোট। বহুভাষাবিদ ও সুপণ্ডিত ছিলেন হরিনাথ দে। আই সি এস হয়েছিলেন।

বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য, তিনি মোট চৌদ্দটি ভাষায় এম এ ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। ঢাকা সরকারি কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯০৭ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি) প্রথম বাঙালি গ্রন্থাগারিক পদে যোগদান করেন। মোট চৌত্রিশটি ভাষা তিনি জানতেন। পরিচয়ের পর হরিনাথ দে তাঁর কাছে পালিভাষা শেখার আর্জি জানান।

ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি

সেই আর্জি নাকচ করা সহজসাধ্য নয়। পুনেতে ফিরে যাওয়ার ভাবনা বাতিল করেন ধর্মানন্দ। কলকাতায় থেকে যান। কলকাতার জনজীবনে একাধিক বড়মাপের মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের অগ্রজ, কবি ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক মনমোহন ঘোষ। মানিকতলা বোমা মামলায় অভিযুক্ত ফাঁসির দন্ডাদেশপ্রাপ্ত বারীন ঘোষের সঙ্গেও ধর্মানন্দের আলাপ হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের দুই খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাসবিহারী ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগস্ট কলকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হলে মুখ্য প্রতিষ্ঠাতাদের অনুরোধে ধর্মানন্দ পালিভাষা শেখানোর দায়িত্ব নেন। প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই সেখানে পালি বিভাগ চালু হয়েছিল। তিরিশ টাকা মাস মাইনে নিতেন তিনি। ইতিহাসের আলোকে দেখতে চাইলে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পালিভাষার পাঠক্রম তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। পঞ্চম মান পর্যন্ত পড়াশুনো করা একটি ছেলে, কিশোর বয়সেই যাঁকে সংসারজীবনে প্রবেশ করতে হয়, নারকেল চারার লালন-পালন করা ছিল যাঁর মুখ্য জীবিকা, ছয় বছন নানা দেশে শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি সংস্কৃত ও পালিভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত একাধিক বিশিষ্ট মানুষের সংস্পর্শে এসে ধর্মানন্দের জীবনবোধ দ্রুত বদলাতে থাকে। জাতীয় আন্দোলনের স্রোতধারায় যে অগ্রণী মানুষেরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর আলাপ-আলোচনা

হয়। স্ত্রী ও কন্যাকে তিনি সাত বছর ধরে দেখেন নি। তাঁদের কথা মনে পড়ে। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে ধর্মানন্দ গোয়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে যান। তখন কলকাতায় শারদোৎসবের ছুটি চলছিল। ছুটি শেষ হওয়ার আগেই তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। ধর্মানন্দকে 'বাঙালি পোশাকে দেখে' স্ত্রী বালাবাঈ কেঁদে ফেলেন। অশ্রুবর্ষণের এমন কারণ ধর্মানন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'স্ত্রী আমার সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার জন্য তৈরি। ছোট্ট মেয়েটি আমার মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ দেখে সঙ্গী হতে রাজি হয়নি।' মেয়েকে তার দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন ধর্মানন্দ। সস্ত্রীক কলকাতায় ফিরলেন। মেয়ে তাঁকে চিনবে কেমন করে? এক মাসের একটু বেশি বয়সী মেয়েকে বাড়িতে রেখে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সে কখনও চিনতে পারে?

স্বামীর সঙ্গে তিনি সংসার করতে পারবেন, ভেবেছিলেন বালাবাঈ। কলকাতা শহর তাঁর ভালোই লাগছিল। মেয়ের কথা ভেবে কষ্ট হতো। মেয়ে যদিও দিদিমার কাছে দিব্যি সুখেই ছিল। সুখ সইল না। ভীষণ অসুখে পড়লেন বালাবাঈ। গোয়ায় ফিরে গেলেন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বালাবাঈ গোয়ায় ফিরে যান। ১৯০৭ সালের ৩১শে জুলাই তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পারিবারিক প্রথা, পিতামহের নামে পৌত্রের নামকরণ করতে হয়। বেঁচে নেই পিতামহ। তাঁর নামে শিশুটির প্রথম নাম হলো 'দামোদর'। পুরোনাম দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি। ডি. ডি. কোসাম্বি।

১৯০৭ সাল। জাতীয় বিদ্যালয়ে পালিভাষার শিক্ষক হিসেবে ধর্মানন্দের এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ওই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রম চালু করতে চান। ধর্মানন্দ রাজি না হলে একাজ সম্ভব নয়। উত্তরে ধর্মানন্দ জানালেন, জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ তিনি ছাড়তে পারবেন না, উপাচার্য এই শর্তে রাজি হলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারেন। স্যার আশুতোষ শর্ত মানতে রাজি হন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রতি মাসে একশো টাকা করে দেবে। দু'জায়গা থেকে মাইনে তিনি নেবেন না। জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি বিনা মাইনেতে পড়াবেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইনে নেবেন। । কথা প্রসঙ্গে বলা যেতে

পারে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সালে উপাচার্য পদে বসার পর থেকেই একাধিক বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে পালিভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সিংহলের মহাবোধি সোসাইটি তাঁকে 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধিতে ভূষিতে করেছিল।

এদিকে ধর্মানন্দ কলকাতা থেকে পুনেতে চলে যেতে চাইছিলেন। পুনে থেকে গোয়া বেশি দূরে নয়। দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে বালাবাঈ নিশ্চয়ই ভালো নেই। কাছাকাছি থাকলে মাঝে মধ্যে তবু যেতে পারবেন। কলকাতায় তখন বরোদার মহারাজা এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধর্মানন্দের এই বিষয়ে কথা হল। মহারাজা তাঁকে বরোদায় আমন্ত্রণ জানান। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিনি বরোদা যান। মহারাজা তাঁকে কলকাতা ছেড়ে বরোদায় চলে আসতে বলেন। অর্থকড়ি তিনি যা চাইবেন দেবেন। উত্তরে ধর্মানন্দ জানালেন, টাকা পয়সা বেশি দরকার নেই। বাড়ির সকলের খরচ হাতে পেলেই চলবে। খুব অল্প মাইনের বিনিময়ে তিনি পুনে বা মুম্বাইয়ে কাজ করতে চান।

মহারাজা বরোদায় ফিরে গিয়ে কয়েকদিন পরেই ধর্মানন্দকে একটি জরুরি তার পাঠান। 'মহারাষ্ট্রের যে কোন জায়গায় থেকে ধর্মানন্দ কাজ করতে পারবেন। আগামী তিন বছর তাঁকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে দেওয়া হবে। প্রতি বছর বরোদা স্টেটের জন্যে তিনি একটি করে যেন বই লিখে দেন।' উত্তরে ধর্মানন্দ জানান, সব গুটিয়ে যেতে তাঁর মাস দেড়েক সময় লাগবে। আর পুনেতে থেকেই তিনি কাজ করতে চান।

এই খবর হরিনাথ দে-র কানে পৌঁছে যায়। মাঝে মাঝে ধর্মানন্দ বর্মায় গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরিকৃত চারশো টাকা দিয়ে পালিভাষায় প্রকাশিত প্রচুর বই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। হরিনাথ দে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সব কথা জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পালিভাষা চর্চা ও গবেষণার আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে হয় তবে ধর্মানন্দকে হারালে চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বৈঠকে প্রস্তাব এল, ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বির মাসিক বেতন একশো টাকা থেকে আড়াইশো টাকা করা হোক। বরোদার মহারাজা তাঁকে তিন বছরের নিয়োগপত্র দিচ্ছেন। যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্তত আগামী তিন বছর না যান, ধর্মানন্দ এই বর্ধিত মাইনে পাবেন।

ভীষণ দোটানায় পড়লেন ধর্মানন্দ। পুনেতে মাইনে পঞ্চাশ টাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইনে আড়াইশো টাকা। পাঁচগুণ বেশি। কী করবেন তিনি? আড়াইশো টাকা মাইনে ছেড়ে এক পঞ্চমাংশ মাইনেতে পুনে চলে গেলেন।

১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে ধর্মানন্দ বোম্বাইতে এসে একটি বাংলো ভাড়া নেন। বন্ধুর বাংলো। স্ত্রী, কন্যা, পুত্রকে এই বাংলোয় তিনি নিয়ে এলেন। ছ'মাস এখানে কাটান। তারপর গিরগাঁওয়ে 'প্রার্থনা সমাজ' যে বাড়িতে ছিল তার উল্টে াদিকে বাড়ি ভাড়া করে চলে আসেন। সেখানেও ছ'মাস-ই ছিলেন। তারপর একা পুনেতে চলে যান। পরিবারের সকলকে গোয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। স্ত্রী বালাবাঈ, কন্যা মানিক ও পুত্র দামোদর তাঁর সঙ্গে একবছর থাকতে পেরেছিলেন।

'প্রার্থনা সমাজ'-এর অন্যতম বিশিষ্ট সংগঠক ছিলেন ডক্টর বাসুদেব অনন্ত সুখটঙ্কার। সংস্কৃত পণ্ডিত। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর জেমস উড্‌স্ নামে এক সাহেব তখন বোম্বাইয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ড. সুখটঙ্কারের হৃদ্যতা ছিল। একদিন ধর্মানন্দের সঙ্গেও এই সাহেবের পরিচয় ঘটে। সুখটঙ্কারের সুপারিশে ওই সাহেব ধর্মানন্দের কাছে চার মাস পালিভাষা নিয়ে পড়াশুনো করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অধ্যাপক ওয়ারেন বৌদ্ধদর্শনের একটি প্রাচীন পুস্তক 'বিশুদ্ধিমগ্গ' নিয়ে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি মারা যান। তখন অধ্যাপক ল্যানমান সেই কাজ শেষ করতে এগিয়ে এলেন। তিনি একা পারছিলেন না। একজন পালিভাষা বিশেষজ্ঞকে কাছে পেলে সুবিধা হয়। ড. উড্‌স সে সময় হার্ভার্ডে ফিরে গিয়েছেন। কথায় কথায় ধর্মানন্দের নাম বললেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পেলেন ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি।

বরোদার মহারাজা তাঁর মাস মাইনে দেন। পুনেতে সবে একবছর হয়েছে। তিনি কি বাইরে যাওয়ার অনুমতি পাবেন? মহারাজা সানন্দে রাজি হলেন। ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জাহাজে পাড়ি দিলেন। দুই বছর হার্ভার্ডে ছিলেন।

'বিশুদ্ধিমগ্গ'-এর কাজ নানা কারণে শেষ হয়নি। তখন জাহাজে আমেরিকা যেতে অনেকদিন লাগত। ইংল্যান্ড হয়ে গিয়েছিলেন ধর্মানন্দ। যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন, একজন ডাচ ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অজানা এক জগতের সন্ধান দিলেন ওই ব্যবসায়ী। কার্ল মার্কস-এর জীবন ও কাজের সঙ্গে পরিচিত হলেন ধর্মানন্দ। নানা সমাজতান্ত্রিক দর্শনের আলোচনায় সমৃদ্ধ হলেন। মার্কস-এর

জীবনকথা, সমাজতান্ত্রিক দর্শনের কথা ধর্মানন্দ জীবনে কখনো ভোলেন নি। হার্ভার্ড থেকে দেশে ফেরার সময়ে তিনি প্রচুর সমাজতন্ত্র বিষয়ক বই পত্র নিয়ে এসেছিলেন। কার্ল মার্কসের জীবনীও নিয়ে এসেছিলেন। বলতে পারি আমরা, ইংল্যান্ডের ওই সময়কার আবহ তাঁর চিন্তার মোড় বদলে দিয়েছিল। ধর্ম নিয়ে এরপর যখন-ই আলোচনা করেছেন, সমাজতান্ত্রিক বীক্ষা তাঁকে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছে।

তাঁর জীবন একটু একটু করে ভিন্নখাতে বইতে শুরু করল। ধর্মানন্দ ও ভাণ্ডারকারের প্রচেষ্টায় পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেই পালিবিভাগ চালু হয়েছিল। দেশে ফেরার পর এক বন্ধু তাঁকে পুনের ফার্গুসন কলেজে যোগ দিতে বলেন। এই কলেজের খুবই নামডাক। র‍্যাঙ্গলার আর পি পরঞ্জপে তখন ওই কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি চিঠি দিলেন, 'আপনাকে আমরা নিয়োগপত্র দিতে পারি। যদিও আমাদের আজীবন সভ্যেরা মাসে একশো টাকা মাইনে পান, আপনার মাইনে হবে পঁচাত্তর টাকা। এছাড়া কলেজে আপনাকে কমপক্ষে পাঁচ বছর পড়াতে হবে।'

'আজীবন সভ্য' বলতে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি'র সদস্যদের কথা বলেছেন অধ্যক্ষ। এই সদস্যপদ অর্জন করতে গেলে স্নাতকোত্তর বা স্নাতক ডিগ্রি থাকলে ভাল। ম্যাট্রিকুলেশন না থাকলে কেউ দরখাস্ত করতেই পারবেন না। হার্ভার্ড ফেরত ধর্মানন্দের সেই বিচারে তো কোন ডিগ্রিই নেই। এমন যুক্তি তাঁর পছন্দ হয়নি। একই কাজের জন্য দু'জন মানুষ ভিন্ন মাইনে পাবেন কেন? হার্ভার্ড থেকে আসার সময়ে ধর্মানন্দ কিছু পয়সা বাঁচিয়েছিলেন। বাবা কিছু টাকা ধার করেছিলেন। সব শোধ দিয়ে হাজার দেড়েক টাকা হাতে রইল। মাসের খরচ কম বেশি একশো টাকা। পঁচাত্তর পেলে পঁচিশ টাকা ওই সঞ্চয় থেকে দিতে হবে। চলবে পাঁচ বছর। তারপর? ভাবতে পারছেন না তিনি।

খবরটা অনেকেরই কানে যায়। ভান্ডারকার ও বরোদার মহারাজ এমন শর্তকে 'অপমানজনক' মনে করেন। মহারাজা সরাসরি লিখলেন, 'আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে এসে সামান্য পঁচাত্তর টাকার মাইনের চাকুরি আপনার পক্ষে কি সম্মানজনক?'

আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসারে 'ডেকান সোসাইটি'র অতুলনীয় অবদান রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশের নানা জায়গায় দেশপ্রেমিক শিক্ষিত মানুষেরা একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ডেকান সোসাইটি শুরুতে নিউ

ইংলিশ স্কুল ও ফার্গুসন কলেজ তৈরি করেছিল। ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর আর. পি. পরঞ্জপে। আমরা সেই কলেজের বি. জে. ওয়াদিয়া লাইব্রেরি থেকে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

১৮৮৫ সালে ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনে শহরে গেলে এখন কলেজটিকে যেখানে দেখা যায়, শুরু থেকে কলেজটি সেখানে ছিল না। প্রতিষ্ঠার বছর দশেক পরে কলেজটি বর্তমান জায়গায় চলে এসেছিল। ১৮৯২ সালে লর্ড হ্যারিস নতুন জায়গায় কলেজটির শিলান্যাস করেন। ১৮৯৫ সালের সাতাশে মার্চ লর্ড স্যান্ডহার্স্ট কলেজের উদ্বোধন করেন।

অল্প কথায় এবার আমরা ডক্টর পরঞ্জপের পরিচয় দেব। পুরোনাম রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরঞ্জপে (১.২.১৮৭৬-৬.৫.১৯৬৬)। ১৮৯২ সালের জানুয়ারিতে তিনি ফার্গুসন কলেজে ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। ১৮৯৪ সালের শেষে বি. এসসি. পাশ করেন। বলতেই হয়, তিনি ফার্গুসন কলেজের প্রথম বিজ্ঞানের স্নাতক। পরের বছর কলেজের ফেলো মনোনীত হন। ইচ্ছে থাকলে ওই সময় তিনি ভাল চাকুরি পেয়ে যেতেন। চাকুরি না করে পড়াশুনো করতে চাইলেন। মেধাবী ছাত্র তিনি। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়ে যান। ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় গবেষক ছাত্র হিসেবে তিনি কেমব্রিজে ভর্তি হন। সবকটি বিষয়ে এত ভাল ফল করেছিলেন যে তিনি র‍্যাংলার নির্বাচিত হন। মনে পড়ছে, আমাদের দেশ থেকে প্রথম যিনি র‍্যাংলার উপাধি পেয়েছিলেন তিনি আনন্দমোহন বসু। সে যাই হোক, একবছর ওই দেশে কাটিয়ে ১৯০২ সালের জানুয়ারিতে স্বদেশে ফিরে আসেন। গণিতের অধ্যাপক পদে ফার্গুসন কলেজে যোগ দেন। ওই সালেই কলেজের কার্যকরী অধ্যক্ষ পদে কাজের সুযোগ পান। ১৯০৪ সাল থেকে একটানা অধ্যক্ষপদে কাজ করে ১৯২১ সালে তিনি অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কোথায় অবসর! মন্ত্রীসভায় আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি সেখানে যোগ দেন। ১৯২৪ সালে ফার্গুসন কলেজে ফিরে আসেন। দুবছর ছিলেন। আয়কর অনুসন্ধান কমিটির অন্যতম

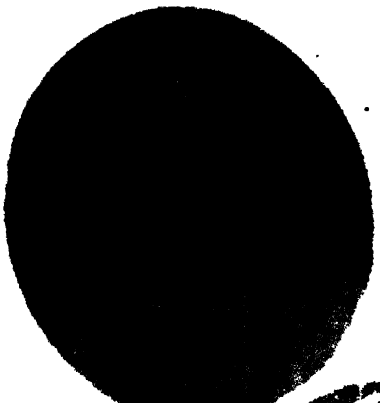

আর. পি. পরঞ্জপে

22256
07-07-09

সদস্য মনোনীত হবার পর ১৯২৫ সালের শেষে দীর্ঘ ছুটিতে যান। ১৯২৭ সালের প্রথমে আবার কলেজে যোগ দেন। দুমাস মাত্র ছিলেন। দুমাস পর মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। ভারতীয় পরিষদে যোগ দিয়ে ইংল্যান্ড চলে যান। ড. পরঞ্জপে মুম্বাই ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিল। ফার্গুসন কলেজে যখন 'ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাঁর প্রথম লাইব্রেরিয়ান হয়েছিলেন (১৯০৭)। ১৯৪৯ সালে চেন্নাই শহরে 'ইন্ডিয়ান র‍্যাশান্যালিস্ট অ্যাসোরিয়েশন' তৈরি হলে তিনি তাঁর সভাপতি হন। দীর্ঘকাল সভাপতি ছিলেন।

খুব অল্পকথায় এই হল অধ্যক্ষ ডক্টর আর. পি. পরঞ্জপের জীবন। ফার্গুসন কলেজ কেমন করে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, এই নিয়ে তাঁর লেখা একটি দীর্ঘ নিবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে। এখানে তার প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা নেই। ডি. ডি. কোসাম্বির পিতা ফার্গুসন কলেজে পড়িয়েছেন। সেকথা আমরা আগে বলেছি। তাঁর সম্পর্কে ডক্টর পরঞ্জপে লিখেছিলেন, 'The college was the first to introduce the study of Pali and it was very fortunate to obtain the services of such a well-known scholar of international reputation as Prof. Dharmanand Kawshambi to teach it'.

১৯৬৪ সালে ফার্গুসন কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক আর. জে. খান্ডেকর অধ্যক্ষ পরঞ্জপের উদ্দেশ্যে একটি সনেট লিখেছিলেন। সনেটটি আমরা নিবেদন করছি।

Principal of Principals, let me pay / My homage king, tribute to admiration ; / Greatness superb in life, worth-veneration, / Is your triumph spendid like sunny day ;/Success supreme in maths did you attain, / Exalting self, College, Country–their name, / 'Prodigy of numbers', renown maintain; / Picturesque in person, tall, fair, impressive, / thundering good in class, in words expressive ; /Principal glorious, Minister great / Ambassador, in lands foreign, of state / Guardian Angel of College ; are roles / You play with honour reaching farthest poles.

১৯০২ সালে তাঁকে নিয়ে নির্বাক তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে। তাঁর কন্যা শকুন্তলা

ষাটের দশকে রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য হয়েছেন। দৌহিত্রি সাই পরঞ্জপে একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক।

১৯১২ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ধর্মানন্দ ফার্গুসন কলেজে পড়িয়েছেন। আমরা দেখতে পাই, এই কয়টি বছর তিনি পরিবারের সকলকে নিয়ে পুনেতে একসঙ্গেই থেকেছেন। কন্যা মানিকের বয়স তখন তেরো বছর। দামোদরের বয়স পাঁচ বছর। এছাড়াও মনোরমা ও কমলা নামে দুই কন্যাসন্তান ছিল। স্ত্রী, তিনকন্যা ও একপুত্র নিয়ে ধর্মানন্দের সংসার। কিছুদিন মোতিচকের ভাড়া বাড়িতে থেকে ডক্টর ভাণ্ডারকারের বাড়ির কাছাকাছি বাড়ি কিনে চলে যান।

১৯১৮ সালে ডক্টর উড্‌স্ হার্ভার্ড থেকে ধর্মানন্দকে আবার আমন্ত্রণ জানান। 'বিশুদ্ধিমগ্গ'-এর কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। তিনি গেলে এই কাজ শেষ করতে সহজ হবে। ধর্মানন্দ ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষের কাছে চাকুরি থেকে পদত্যাগের নোটিশ পাঠালেন। অধ্যক্ষ বললেন, 'একশো টাকা মাইনে পাবেন, চাকুরি ছাড়বেন না।' প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন ধর্মানন্দ। কলেজ তখন তাঁকে দু'বছরের ছুটি দিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার মার্কিন যাত্রা। এবার তিনি একা যাননি। জ্যেষ্ঠা কন্যা মানিক ও পুত্র দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। মানিকের বয়স তখন উনিশ। পুত্রের বয়স বারো বছর। চার বছর রইলেন হার্ভার্ডে। তবু কিছু বিতর্কের জন্য 'বিশুদ্ধিমগ্গ'-এর কাজ শেষ হল না।

পোল্যান্ডের বিখ্যাত গণিত অধ্যাপক ভাইনার তখন হার্ভার্ডে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে গভীর সখ্য হল। তাঁর কাছে রুশ ভাষা শিখলেন। ধর্মানন্দ ও কন্যা মানিক ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে ভারতে ফিরলেন। দামোদর পড়াশুনোর জন্য থেকে গেলেন। সে সব কথা পরে বলব।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে ফেরার পর তাঁর জীবনে নতুন এক পর্বের সূচনা হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। গান্ধীজী তখন আমেদাবাদে 'গুজরাট বিদ্যাপীঠ' স্থাপন করেছেন। স্বদেশী শিক্ষা দেবেন। ব্রিটিশ শিক্ষাকে এদেশে আসতে দেবেন না।

বিদ্যাপীঠে একটা পুরাতত্ত্ব বিভাগ ছিল। বিভাগের একটা অধ্যাপক পদ ফাঁকা। মাইনে মাসিক আড়াইশো টাকা। ধর্মানন্দ অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন। গান্ধীজী

জানেন, তাঁর ছেলে দামোদর আমেরিকায় পড়ছে। পড়ার খরচ পাঠাতে হবে প্রতিমাসে। মাইনে গান্ধীজী তাই একশো টাকা বাড়িয়ে দেন। আড়াইশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা। বিভাগে তিনি তিন বছর ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

১৯২৬ সালে তাঁর তৃতীয়বার মার্কিন যাত্রা। বেশিদিন থাকেন নি সেইবার। মাত্র একবছর ছিলেন।

আমেরিকা দর্শন হল। সোভিয়েত দেশ দেখার আগ্রহ। অনেকটা কাকতালীয়ভাবে সুযোগ এসে যায়। জওহরলাল ও তাঁর পিতা মতিলাল নেহরু সোভিয়েত দেশে গিয়েছেন। সোভিয়েত বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে তাঁদের ওই দেশে যাত্রা। ফিরে এসে নেহরু তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখলেন। লেনিনগ্রাদের এক প্রতিষ্ঠানে কেমন গভীর বৌদ্ধধর্ম চর্চা হয় সে কথাও লিখলেন। ধর্মানন্দ সেই প্রতিষ্ঠানের কথা পড়ে সেখানে যেতে আগ্রহী হন। নেহরুর কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন ধর্মানন্দ। নেহরু তাঁকে খুশি হয়ে কয়েকটা ঠিকানা দেন। চিঠিপত্র লিখলেন ধর্মানন্দ। কিছুদিন পর সোভিয়েত যান তিনি। লেনিনগ্রাদের ওই প্রতিষ্ঠানে ও লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি নিয়ে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা ও গবেষণা করেন। মস্কো সহ সোভিয়েতের অনেক শহর ঘুরে দেখেন ধর্মানন্দ। বিপ্লবের বারো বছর পার হয়েছে। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের সমাজ জীবন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন তিনি।

১৯৩০ সাল। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন ধর্মানন্দ। অতটাই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি, কংগ্রেসের বোম্বাই প্রাদেশিক সভা তাঁকে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে লবণ সত্যাগ্রহের মূলবার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন। থানে জেলখানায় একবছর কারাবন্দী ছিলেন। হাইকোর্টের রায়ে তিনি নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়ে ছাড়া পান।

আমেরিকায় ধর্মানন্দ মোট চারবার গিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি শেষবারের মতো আমেরিকায় যান। দু'বছর ছিলেন। ফিরে এসে কয়েক সপ্তাহের জন্য রাশিয়ায় যান। দেশে ফিরে তিনি পুনে, বারাণসী হিন্দু বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে বেড়ান। সারাটা জীবন তিনি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ডায়াবেটিস রোগে শেষ জীবনে তাঁর শরীর ভীষণ ভেঙে পড়েছিল।

সম্পদের লোভ তাঁর কোনকালেই ছিল না। প্রবল অনুসন্ধিৎসু মন ছিল। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন। কোন ধর্মসম্প্রদায় গড়েন নি। ধর্মীয় আচার আচরণের বেড়াজালে নিজেকে জড়াননি কখনো। ভাবালুতা তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বরাবরই সমাজ সচেতন ছিলেন। জীবনীকার জে এস সুখটঙ্কার তাঁকে 'ধর্মপ্রাণ নাস্তিক' শিরোনামে অভিহিত করেছিলেন। প্রকৃত বিচারে তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ যাঁর মননে গভীর সামাজিক ভিত্তি ছিল।

পুনের 'বসন্ত ব্যাখ্যানমালা' খুবই প্রসিদ্ধ। কোনো বিশিষ্ট মানুষ প্রতিবছর এই উপলক্ষে নির্ধারিত বিষয়ের উপর একাধিক বক্তৃতা পরিবেশন করেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার এই বক্তৃতামালা সম্পর্কে খুবই সপ্রশংস উক্তি বেশ করেছেন। ১৯১২ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি সবে ফার্গুসন কলেজে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে 'বসন্ত ব্যাখ্যানামালা'-য় বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হল। তিনি যে বিষয় বেছে নিয়েছিলেন তার শিরোনাম 'কার্ল মার্কস : জীবন ও চিন্তা।' মনে রাখতে হবে, তখনও এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সোভিয়েত বিপ্লব তাঁর বেশ কয়েক বছর পরে সমাধা হয়েছে।

গান্ধীজীর প্রতি ধর্মানন্দের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গান্ধীজী যখন বললেন, দেশের বৃহৎ ভূ-স্বামী ও পুঁজিপতিদের প্রতি সকলের সামাজিক আস্থা রাখা উচিত, তিনি প্রকাশ্যে এমন অভিমতের বিরোধিতা করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, রাজনৈতিক প্রশ্নে তিনি কোনো ব্যক্তির অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। বিষয় ও তার বিশ্লেষণই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি ছিলেন বিনয়ী। নইলে বলতেন না, "মার্কস-এর 'দি ক্যাপিটাল' পড়ে আমি কিছু বুঝতে পারিনি।"

ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি মুম্বাই শহরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য 'বহুজনবিহার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পৃথিবীর সকল দেশ থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই আশ্রয়স্থলে আসতেন।

জীবনের অন্তিমকালে তিনি অনশনব্রত পালন করেছেন। দেশের স্বাধীনতার মাত্র আড়াই মাস আগে ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন সেবাগ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়। গান্ধীজী তখন দিল্লিতে ছিলেন। সন্ধেবেলা প্রার্থনা সভায় তিনি ধর্মানন্দের স্মরণে প্রার্থনা করেন।

মারাঠি ভাষায় তিনি 'ভগবান বুদ্ধ' নামে একটি বই লিখেছিলেন। 'সাহিত্য একাডেমি' এই বইটি ইংরেজি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছে। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বিষয়ে ধর্মানন্দ মোট এগারোটি বই লিখেছেন। মারাঠি ভাষায় তাঁর লেখা আত্মজীবনী 'নিবেদন' প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোয়ার সামাজিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। নিজের জীবনযুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন।

বাবার আদর্শ ও কর্মধারার উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা তাঁর সুসন্তান দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির মধ্যে আজীবন দেখতে পেয়েছি। আমাদের আলোচনা থেকে সে কথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। কিছু কিছু বিষয়ে পুত্র নিশ্চয়ই পিতার চেয়ে অগ্রণী ছিলেন। সেসব কথাও আমরা এখানে বলব।

## শৈশব কৈশোর : পুত্র দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি

১৯০৭ সালের ৩১ শে জুলাই দামোদরের জন্ম। সে কথা আমরা আগে বলেছি। বাবা ধর্মানন্দ তখন কলকাতায়। প্রথম পাঁচবছর দামোদর মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছেন। ১৯১২ থেকে ১৯১৮ বাবা ফার্গুসন কলেজে ছিলেন। তখন সবাই একসঙ্গে থেকেছেন। ফলে ছয় থেকে এগারো বছর পর্যন্ত দামোদর বাবা মা ও তিন বোনের সঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছেন। বড় হয়ে বলেছেন, এমন সুখের দিন তাঁর জীবনে আর কখনো আসেনি।

পুনের নাম করা স্কুল ছিল 'নিউ ইংলিশ স্কুল। সেখানে দামোদর ভর্তি হন। তাঁর মেধা সকল শিক্ষকের নজর কেড়েছিল। আট বছর হওয়ার আগেই তাঁর প্রাথমিক স্কুলের সকল পড়া শেষ হয়ে যায়। ১৯১৫ সালে তিনি ইংলিশ স্কুলের প্রথম মানে ভর্তি হন (এখনকার পঞ্চম শ্রেণির সমান)। বোন মনোরমা দাদার স্কুলের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ক্লাসে যখন সকলে পরাস্ত, দাদার ডাক পড়ত। মাস্টারমশাই হেঁকে বলতেন, এবার আমরা দেখি, আমাদের ছোট্ট অভিমন্যু কী করে।' মহাভারতের অভিমন্যুর গল্প সকলেই জানেন।

গণিতবিদ্যায় দামোদর আন্তর্জাতিক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। অথচ তার শুরুটা ভাল ছিল না। নিচু ক্লাসের পরীক্ষায় একবার তিনি অঙ্কে ১৩৫-এর মধ্যে ২৮ পেলেন। ইতিহাস-ভূগোলে ৭৫ এর মধ্যে ১৯ পেলেন। প্রগতিপত্রে ক্লাস টিচার লিখে দিয়েছেন 'অঙ্কে খুব দুর্বল'। জেদ চাপল মাথায়। মাস্টারমশাইকে এমন লেখার সুযোগ আর কস্মিনকালেও দেবেন না। প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছিলেন।

ছোটবেলায় দামোদরের শরীর প্রায় সময়েই খারাপ থাকত। এমনিতেই ছিল রোগাটে শরীর। সর্দি-জ্বর তাঁর প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিল। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেতেন। বেঁটেখাটো ছিলেন। দু-বছরের ছোট বোন মনোরমা। অথচ দৈর্ঘ্যে দুজনই সমান। সবচেয়ে ছোটবোনের নাম কমলা। সে আবার দাদার অন্য খুঁত ধরেছে। মা নাকি দাদাকেই বেশি প্রশ্রয় দিতেন। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বেশির ভাগ ঘরে আজও মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি প্রশ্রয় পায়, কথাটা কি মিথ্যে? বড়দের সব কথা মান্য করতেন না দাদা। যা ঠিক মনে হতো না, দাদা

তর্ক করতেন। বোনের এ সব ভাল লাগেনি। মা প্রশ্রয় দিলেও বাবা দিতেন না। অন্যায় দেখলে বকতেন। সব সময় ভুগতেন বলেই হয়তো বা, তিরিক্ষি মেজাজের ছিলেন দামোদর। কেউ তাঁর জিনিসে হাত দিলে ক্ষেপে যেতেন। মনটা তাঁর উদার ছিল। কেউ বিপদে পড়লে দৌড়ে আসতেন। সংসারের বড় কোন কাজ করতেন না। তবে কেউ অসুখে পড়লে পাশে থাকতেন সবসময়। বোনই তো লিখেছিলেন, একবার তাঁর কনজাঙ্কটিভাইটিস হয়েছে। সংক্রমণের ভয়ে কেউ কাছে আসেনি। চোখ বাঁধা থাকত। হাঁটা চলা করা মুশকিল ছিল। দামোদর স্কুল থেকে এসে বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে বোনের কাজে লেগে পড়তেন। বদমেজাজ ছিল সত্যি। হঠাৎ ক্ষেপে যেতেন একথাও সত্যি। তবে সংকীর্ণমনা কখনও ছিলেন না।

১৯১৮ সালে ধর্মানন্দ যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকা যান, কন্যা মানিক কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। বাবা ভাবলেন, মেয়েকে নিয়ে আমেরিকা যাবেন। বাকিরা সব পুনেতেই থাকবেন। মেয়েকে তিনি আমেরিকায় পড়াশুনোর সুযোগ করে দেবেন। বালাবাঈয়ের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তিনি সবাইকে নিয়ে পুনেতে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। গোয়ায় ফিরে যেতে চাইছেন। দামোদর স্কুলে পড়ছেন তখন। থাকবেন কোথায়? হোস্টেলে থাকতে পারতেন। শরীরের যা অবস্থা, একা রেখে যেতে বাবা মা কেউই সাহস পাচ্ছেন না। পড়াশুনোয় দামোদর অনেক এগিয়ে। তিন বছর আগে চৌদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে যাবেন। বাবা ওসব ভাবলেন না। দামোদরকেও আমেরিকা নিয়ে গেলেন।

বিমানে আমেরিকা যেতে পুরো একদিন লাগে না। জাহাজে আমেরিকা যাওয়া অনেকদিনের ব্যাপার। ১৯১৮ সালের জুন মাসে তিনজনে মিলে জাহাজে করে রওনা হলেন।

সুয়েজ খাল পার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। সিঙ্গাপুর ও জাপান হয়ে সানফ্রান্সিসকো যেতে হল। পুরো চারমাস লেগেছিল। সানফ্রান্সিসকো থেকে ট্রেনে করে বোস্টন। ট্রেনে যাওয়ার সময় দামোদর ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাবু হয়ে পড়লেন। জ্বর ছাড়লেও শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল। ১৪ই অক্টোবর সকলে বোস্টন পৌঁছলেন। ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের কেমব্রিজ শহরে ঘর নিলেন। কাছেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। মানিক ও দামোদরকে কলেজ ও স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ধর্মানন্দ। ছেলে-মেয়ের নতুন জীবন শুরু হল।

ওইসময় ভারত থেকে বিদেশে খুব বেশি ছেলেমেয়ে পড়তে যেত না। রাজা উজির ও জমিদারের ছেলেরা পয়সার জোরে যেত। মধ্যবিত্ত ঘরের মেধাবী ছেলেরা দু'চারজন স্কলারশিপ নিয়ে যেত। আমেরিকায় যেত কম। পরাধীন ভারত থেকে ব্রিটেনেই যেত বেশি। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও লন্ডনের পাশ করা ছেলেরা দেশে ফিরলে বাড়তি সমাদর পেতেন। আঙুলে গোনা যায় এমন দু'চারজন সে সময় আমেরিকায় পড়তে গিয়েছেন। বাবাসাহেব আম্বেদকর গিয়েছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ গিয়েছিলেন। তালিকা খুব বড় নয়। 'ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'র ক্যাম্পাসে দু'চারজন ভারতীয় ছাত্র দেখা যেত। স্কুলে পড়তে গিয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্র তখন কোথায়? ঘটনাক্রমে দামোদর স্কুল থেকেই আমেরিকায় পড়াশুনা শুরু করলেন।

আমেরিকায় স্কুল ছিল দুরকমের। সাধারণ বিষয় নিয়ে পড়াশুনোর স্কুল। নানা ভোকেশনাল পাঠক্রম পড়ানোর স্কুল। ধর্মানন্দের ধারণা ছিল, কেতাবি পড়াশুনো করে দেশে ফিরলে ছেলের তেমন কিছুই জুটবে না। ভোকেশনাল কোর্স পড়াই ভাল। রিন্‌জ্ টেকনিক্যাল হাইস্কুলে ভর্তি হলেন দামোদর। শরীর তাঁর দুর্বল, সেকথা আগেই বলেছি। ফ্লু'র শিকার হলেন। ক্লাসে ভারী ভারী যন্ত্রপাতি চালাতে হয়। এধার ওধার করতে হয় এমন শক্ত (!) কাজ দামোদরের অশক্ত শরীরে কুলিয়ে উঠছিল না। স্কুলের প্রিন্সিপাল, মাস্টারমশাইদের কাছে দামোদরের অসামান্য মেধার খবর পাচ্ছিলেন। একদিন প্রিন্সিপাল ধর্মানন্দকে ডেকে পাঠান। বললেন, 'আপনার ছেলের যা মেধা, এই স্কুলে তাকে মানায় না। এখানে পড়াশুনো করলে আপনার ছেলে কাঠমিস্ত্রি হতে পারবে, কামার হতে পারবে। ওকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করুন। টেকনিক্যাল বিষয় পড়তে চাইলে পরে কোনো ভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াবেন।'

প্রিন্সিপালের পরামর্শমত ধর্মানন্দ ছেলেকে কাছেই হার্ভার্ড গ্রামার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। প্রাথমিক ক্লাসের পড়াশুনো অনেকটাই দামোদর এদেশে করে গিয়েছিলেন। তবে ওখানে আবার পড়তে হল। প্রাথমিকের পড়াশুনোয় কোনো খরচ নেই। বিনা পয়সায় বই পাওয়া যায়। অসুখ করলে বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়। প্রাইমারি পড়তে গিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা হল যখন, তাঁর টনসিলাইটিস ধরা পড়ল। ডাক্তার বললেন, তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে হবে। টনসিল কেটে বাদ

দেওয়া হল। দামোদর ধীরে ধীরে সেরে উঠলেন। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন, জিমনাসিয়ামে গিয়ে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। বলতে ভাল লাগছে, একটু একটু করে দামোদর চমৎকার সেরে উঠেছিলেন। এরপর থেকে তাঁকে এমন নিয়মিত অসুখের কবলে পড়তে হয়নি।

প্রাথমিক ক্লাসে দামোদর পড়লেন বটে, তবে মাত্র একবছর। তারপর হার্ভার্ড গ্রামার স্কুল ছেড়ে দিয়ে ১৯২০ সালে 'কেমব্রিজ হাই অ্যান্ড লাতিন স্কুল'-এ ভর্তি হন।

নিয়মিত পড়ছেন দামোদর। নানা দেশের নানা ভাষায় লেখা সাহিত্য পড়ছেন। নিয়মিত সাহিত্য পড়ায় ভাষার প্রতি তাঁর দখল অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। লাইব্রেরিতে বইয়ের অভাব ছিল না। সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানের বইও পড়তেন প্রচুর। অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। যা পড়তেন, মনে রাখতে পারতেন। বিজ্ঞানের বইগুলো পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত। চার্ট ও ছবি ছিল পাতায় পাতায়। শক্ত বিষয় সহজ করে লেখা। বিজ্ঞানের জগতে যিনি ডুবে থাকেন, তার মনন নিজের অজ্ঞাতসারেই যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, অলৌকিকতা ভেতরে বাসা বাঁধতে পারে না। দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি তার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ।

পড়াশুনো করছেন। শরীরচর্চা করছেন। কোনো একসময় তিনি যে রোগাটে ও ছোটখাট চেহারার ছিলেন, তাঁকে দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। খেলাধুলো, সাঁতার কাটা, স্কেটিং—সবকিছু তিনি সমান তালে চালিয়েছেন। স্কাউট দলের সদস্য ছিলেন তিনি। স্কাউটিং-এ দক্ষতা দেখিয়ে প্রচুর পদক লাভ করেছেন। বোন মনোরমা লিখেছিলেন, দাদা যখন দেশে ফিরছেন, তাঁর স্কাউটিং শার্টে পদক লাগাবার কোনো ফাঁকা জায়গা ছিল না।

এগারো বছর বয়সে বাবা ও উনিশ বছরের দিদির সঙ্গে আমেরিকায় এসেছিলেন দামোদর। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। দিদি মায়ের মত যত্ন করেছেন। বাবার সারাক্ষণ সতর্ক নজর ছিল। হার্ভাডের বিখ্যাত অধ্যাপকেরা সব বাবার কাছে প্রায় সময়েই আসতেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দামোদরের খুব ভাল লাগত। তাঁদের কাছ থেকে যে তিনি কত নতুন কথা জানতে পেরেছিলেন, তা লিখে শেষ হবার নয়। একজন অধ্যাপকের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। তাঁর নাম লিও ভাইনার। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাভিক ভাষা পড়াতেন। তাঁর কাছে ধর্মানন্দ রুশভাষা

শিখেছিলেন। লিও ভাইনারের পুত্র ছিলেন নর্বার্ট ভাইননার। গণিত জগতের অন্যতম দিকপাল। দামোদরের চেয়ে তেরো বছরের বড় ছিলেন নর্বার্ট। ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছেন। নর্বার্টের স্ত্রী ও দিদি মানিক কলেজে সহপাঠী চিলেন। একথা বলতে দ্বিধা নেই, নর্বার্টের আদর্শ ও মূল্যবোধ দামোদরের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। দু'জনের নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল আজীবন।

১৮৯৪ সালে নর্বার্ট ভাইনারের জন্ম। শৈশবেই তাঁর গাণিতিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁকে 'বিস্ময়কর বালক' বলা হতো। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যার স্নাতক পাঠক্রমে ভর্তি হন। কিছুদিন পর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নর্বার্ট গণিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। অত কম বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের অধিকারী আর কেউ পৃথিবীতে আছেন বলে জানা নেই। দর্শনবিদ্যায় তাঁর শিক্ষক ছিলেন বিশ্বসেরা দুই গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক। এঁদের নাম বার্ট্রান্ড রাসেল ও ডেভিড হিলবার্ট। কী যে দ্রুত তিনি বিষয়ের পর বিষয় বদলেছেন, ভাবতে অবাক লাগে। সাংবাদিকতা করেছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছেন। ১৯১৯ সালে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে গণিতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই অবসর গ্রহণ করেছেন।

ব্রাউনিয় গতি, স্থৈতিক বলবিদ্যা ও বিশৃঙ্খল অবস্থা (chaos) নিয়ে কাজ করেছেন নর্বার্ট। কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও স্থিতি তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পরিসংখ্যান পদ্ধতি স্নায়ুশারীর বিজ্ঞান, কম্পিউটার ডিজাইন ও জীব রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি বর্ণনায় প্রযোগ করেন। তাঁর হাতে 'সাইবারনেটিক্‌স্' নামে জ্ঞানচর্চার এক নতুন শাখা জন্মলাভ করে। তাঁকে এই বিদ্যার জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গণিতজ্ঞ হিসেবে তাঁর দক্ষতা সকল সন্দেহের বাইরে। তবে তাঁর বহু গবেষণাপত্র বিশেষজ্ঞদের কাছেও জটিল মনে হয়। অনেকগুলি ভাষায় কথা বলতে পারতেন নর্বার্ট। শিক্ষক হিসেবে জনপ্রিয়তা তিনি তেমন পাননি।

ইহুদি পরিবারে ভাইনারের জন্ম। কিন্তু পুরোপুরি নাস্তিক ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতেন না। পৃথিবীর গরিব মানুষ ও আমেরিকার সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় এই বিজ্ঞানী বারবার সোচ্চার

হয়েছেন। প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমেরিকা যখন মানহাটন প্রকল্প গ্রহণ করে, একগুচ্ছ মেধাবী বিজ্ঞানী সেই পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছিলেন। নর্বার্ট ভাইনার যোগ দেননি। যুদ্ধ গবেষণায় যে কোনোরকমের সহযোগিতা তিনি বর্জন করেছিলেন। তবে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার অস্ত্র নির্মাণ গবেষণায় তিনি কাজ করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যে অস্ত্র মানুষ খুন করতে রওনা দিয়েছে, তাকে মাঝপথে ধ্বংস করতে পারলে যুদ্ধবিরোধী ভূমিকাই পালন করা হয়। ১৯৪৭ সালে তিনি প্রকাশ্যে জানালেন, যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা কোন বিষয়েই তিনি গবেষণা করবেন না। তবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিবাদ জানিয়ে যাবেন।

নর্বার্ট ভাইনার

যাঁরা নর্বার্ট ও দামোদরকে দেখেছেন তাঁদের অনেকেই বলেছেন, দু'জনের চিন্তাভাবনায় কোনো ফারাক নেই। ফারাক যদি খুঁজতেই হয়, নর্বার্ট ছোটোখাটো ছিলেন। দামোদর যে তাঁর দেহের স্বাভাবিক উচ্চতা লাভ করেছিলেন, সেকথা আমরা আগে বলেছি। মোট চার খণ্ডে নর্বার্ট ভাইনারের যাবতীয় লেখাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে সর্বশেষ খণ্ডটি 'এম আই টি প্রেস, কেমব্রিজ' থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানকার কয়েকটি রচনার শিরোনাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর চিন্তার জগতকে বুঝতে সাহায্য করবে। তিনটি রচনার শিরোনাম দেওয়া হল। 'সাইবারনেটিক্স্', 'সায়েন্স অ্যান্ড সোসাইটি', 'এথিক্স্, ইসথেটিক্স্ অ্যান্ড লিটারির ক্রিটিসিজম'। এমন আরও নানা বিষয়ে প্রচুর রচনা রয়েছে। যাঁরা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তাঁদের অবশ্যই নর্বার্ট ভাইনারের লেখা পড়তে হবে। ১৯৬৪ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

দিদি মানিক ১৯২২ সালে রেডক্লিফ কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছেন। বাবা ধর্মানন্দ যে কাজ নিয়ে এসেছিলেন, তাও শেষ হয়েছে। দামোদর এখন ষোলো বছরের কিশোর। তাঁকে হোস্টেলে ভর্তি করে বাবা ও দিদি দেশে ফিরে যান। প্রতি মাসে দামোদরের খরচ ছিল পঁচিশ ডলার। ভারতীয় টাকায় পঁচাত্তর টাকা। হ্যাঁ, তখন প্রতি ডলারের মান আমাদের তিন টাকার সমান ছিল। ধর্মানন্দ প্রতি মাসে ছেলেকে সেই টাকা পাঠিয়ে দিতেন। হোস্টেলে থেকে পড়ার সময় দামোদর নিয়মিত ওয়াই এম সি এ বিল্ডিংয়ে যেতেন। সেখানকার জিমনাসিয়ামে ব্যায়াম করতেন। সিনেমা প্রায় নিয়মিতই দেখতেন। বাবার পাঠানো টাকা দিয়ে একটুও বাড়তি খরচ চালানো যেত না। সপ্তাহে দু'দিন, শনি ও রবিবার, দামোদর আরও অনেকের মত ডেয়ারি ফার্ম বা ফলের বাগানে কাজ করতেন। ডেয়ারিতে নিজের হাতে গোবর সাফ করতেন। বাগানে ঝাড়ু দিতেন। জল দিতেন। শ্রমের মর্যাদা তিনি ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করেছিলেন।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় দামোদর খুব ভাল ফল করেছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাইলে তখন এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে হতো। যাদের ফল খুব ভাল তেমন কয়েকজন সরাসরি ভর্তি হতে পারতেন। দামোদর মেধা তালিকায় জায়গা করে সরাসরি ভর্তির সুযোগ পেয়ে যান। যে স্কুল থেকে পাশ করেন দামোদর, সে স্কুল প্রতি বছর তাদের বার্ষিক বুলেটিনে পাশ করা ছাত্রদের ছবি দিয়ে পাশে দু'চার লাইন লিখত। দামোদর সম্পর্কে কী লিখেছিল, আমরা নীচে দিলাম।

"Kosambi, Damodar D. 'Baba'
380 Harvard Street
Harvard Grammer School
New English School, Poona, India
'The Rest to Some Faint Meaning Make Pretence
But Baba Never Deviates To Sense.'
Swimming, 1923
Track, 1923
Winner, Review Library Contest, 1923
Harvard."

দামোদরের ডাক নাম ছিল 'বাবা'। যেমন ধর্মানন্দেরও একটা ডাক নাম ছিল। পরিচিতরা সকলে ধর্মানন্দকে 'বাপু' নামে ডাকতেন।

হার্ভার্ডে ভর্তি হলেন দামোদর। স্কলারশিপও পেলেন। সবকটি বিষয়েই ভাল করছিলেন। অঙ্ক তাঁর কাছে ছিল আর সব বিষয়ের চেয়ে আলাদা। নিজেই একজায়গায় বলেছেন, 'গণিতের মোহিনীশক্তি প্রতিরোধ করতে পারিনি বলে আমি এই বিষয়টি পছন্দ করেছি।' স্কুলে প্রিন্সিপালের পরামর্শে ভোকেশনাল কোর্স ছেড়েছিলেন। পাশে এম আই টি রয়েছে। চাইলে ভর্তি হতে পারতেন। ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইলেন না। ভালোই তো হল আমাদের। নইলে যে ডি ডি কোসাম্বিকে আমরা পেয়েছি, তাঁর জীবনধারা ভিন্নপথে প্রবাহিত হতে পারত।

ইঞ্জিনিয়ার হলেন না বটে, হার্ভার্ডে রইলেনও না বেশিদিন। ১৯২৪ সালের শেষদিকে তিনি হার্ভার্ড ছেড়ে দেশে ফিরে এলেন।

১৯২৪ সাল। বাবা ধর্মানন্দ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগে রয়েছেন। দিদি মানিক ইন্দোরে অহল্যা গার্লস স্কুলে সুপারিন্টিডেন্টের চাকুরি করছেন। মা ও দুই ছোটবোন দিদির কাছেই থাকেন। দামোদর আমেদাবাদ-ইন্দোর আসা যাওয়া করছেন। থিতু হবেন না? তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কই! আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম খুব কাছেই। সেখানে ধর্মানন্দ মাঝে মাঝে যান। গান্ধীজীর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হয়। চারপাশে তখন এক ঝাঁক বড়মাপের মানুষ। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন আচার্য কৃপালনি। গান্ধীজীর জীবনযাত্রা দামোদরকে খানিকটা প্রভাবিত করেছিল। বেশ কিছুকাল দামোদর খাদিও পড়েছিলেন। তবে গান্ধীজীর দর্শন ও সমাজচিন্তার বিপরীত মেরুতে ছিল তাঁর অবস্থান। সেকথায় আমরা পরে যাব।

আমেদাবাদ ও ইন্দোর বাদ দিয়ে দামোদর মাঝেমাঝেই গোয়া চলে যেতেন। গোয়ায় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রচুর। যখনই যেতেন চারপাশে তাকিয়ে তাঁর মনে হোত, গোয়ার খনিজসম্পদ ও জলসম্পদ তেমন কাজে লাগানো হচ্ছে না। একটা রাইফেল কাঁধে নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে শিকারে বেরোতেন দামোদর। বলতেন, শিকারে যাচ্ছেন। আসলে এখানে ওখানে পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী খুঁজে বেড়াতেন। আর একটা কাণ্ড করতেন। পরপর বুলেট ছুঁড়তেন। বুলেটের সঞ্চার পথ অধিবৃত্তাকার, সেকথা স্কুলের একটু উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারাও জানে। দামোদর জানতে চান—বায়ুর ঘর্ষণ, বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ, বুলেটের সাইজ ইত্যাদি তার সঞ্চারপথকে কিভাবে প্রভাবিত করে। দামোদর বেশ কয়েকটি গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করেছিলেন এই বিষয়ে।

ফল যা হবার তাই হল। কলেজে মাস্টারমশাই যখন বুলেটের সঞ্চারপথের সমীকরণ পড়াচ্ছিলেন, পুরোটাই তাঁর 'মুখস্থবিদ্যা' মনে হয়েছে। 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই', এমনটা ভেবে তিনি ক্লাসেই রইলেন না। পুরো ১৯২৫ সাল দামোদর এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এদিকে ধর্মানন্দ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে হার্ভার্ড রওনা দেন। দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে যান। হার্ভার্ডে তো ভর্তি হয়েইছিলেন। আবার সেখানে দামোদর ক্লাস করতে শুরু করেন।

১৯২৬ থেকে চার বছর পড়াশোনা করে দামোদর স্নাতক হলেন। ওই সময় আমেরিকায় মহামন্দা দেখা দেয়। তিরিশের মহামন্দা। ইচ্ছে থাকলেও ডক্টরেট ডিগ্রি না করে তাঁকে আবার ভারতে ফিরতে হয়। বাবা দেড় বছর পর দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। একটা বাড়ির দু'তলায় ভাড়া ছিলেন পিতাপুত্র। বাবা চলে যাওয়ার পর দামোদর ওই বাড়ির সবচেয়ে উঁচুতে সিঁড়ি তলায় একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিলেন। ভাড়া মাসে চার ডলার। ঘরে একটা মাত্র জানালা। ঘর গরম রাখার কোনো আয়োজন নেই। অজানা জগতের একনিষ্ঠ অনুসন্ধানী দামোদর। কেমন ঘরে থাকছেন, কোনোসময়েই তাঁর মনে হয়নি। ঘরে একটি মাত্র ছবি টাঙানো ছিল। সেটি গান্ধীজীর। আর চারপাশে বই। নানা বিষয়ের বই। জার্মান ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের প্রচুর বই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বিজ্ঞানের রাষ্ট্র বলতে জার্মানিকেই বোঝাত। ভাষাবিজ্ঞানের প্রচুর বই। লাতিন, গ্রিক, জার্মান, ফ্রান্স ও আরও একাধিক ভাষার বাইবেল তাকে পরপর সাজানো রয়েছে। ভাষা শিখতে এই বাইবেলগুলি তাঁর খুব কাজে লেগেছে। একই কথা কোন্ ভাষায় কেমন হয়, বাইবেল দেখে বের করে নিতেন। ফরাসি, ইতালি ও জার্মান সাহিত্যের প্রচুর পেপারব্যাক সংস্করণও ছিল। এককথায় বলতে পারি, পৃথিবীর খুব কম কলেজ পড়ুয়ার ঘরেই এমন সংগ্রহ দেখা যায়। যে তলায় থাকতেন দামোদর, আরও তিনটি ঘর ছিল। সেখানে তিনজন আমেরিকার ছাত্র ছিলেন। এঁরা সকলে 'ভারতীয়' ছাত্রের এমন সংগ্রহ দেখে বিস্মিতবোধ করতেন।

পড়ার বিষয়ে আরও একটা কথা বলতে হয়। গোয়েন্দা গল্প পড়তে তিনি ভালোবাসতেন খুব। সেসব বই প্রচণ্ড দ্রুত পড়তেন। বেশ ক'বছর পর তিনি যখন 'টি আই এফ আর'-এ যোগ দিয়েছিলেন, পুনে থেকে রোজ সেখানে যেতেন। পুনে থেকে মুম্বাই। 'ডেকান কুইন'-এ যেতেন। তিনখানা গোয়েন্দা গল্পের পেপারব্যাক শেষ হয়ে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকর্মীর মুখে শুনেছি, তাঁর ট্রেনে যাওয়ার

জায়গা ছিল নির্দিষ্ট। কেউ সেখানে বসতেন না। রেল কোম্পানি নাকি তাঁর বসার সিটের সামনে একটা পড়াশোনার টেবিল লাগিয়ে দিয়েছিল।

সিনেমা দেখার শখ ছিল। সপ্তাহে দু'তিনটে সিনেমা দেখতেনই। পশ্চিমী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান কাছাকাছি থাকলে যেতেন। নানারকমের সিমফোনি শুনতেন। আর একটা অভ্যাস ছিল। কেমব্রিজ শহরের মধ্য দিয়ে চার্লস নদী বয়ে গেছে। চার্লস-এর তীর ধরে ছুটির দিন বন্ধুদের নিয়ে হাঁটতে যেতেন। বন্ধুরা অনেকে হাঁপিয়ে উঠতেন। তিনি ক্লান্তিহীন। পুনেতে যখন পাকাপাকি থেকেছেন, এই অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। সময় পেলেই হনুমান পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন।

খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনো বাছবিচার ছিল না। তাঁর বাবা ধর্মানন্দ ছিলেন নিরামিষাশী। দামোদর সবরকমের খাবার খেতেন। মুসলমান হোটেলে যেতে কোনো আপত্তি ছিল না। চীনা হোটেলেও যেতেন। ১৯২৫-৩০-এর দশকে একজন মারাঠি ব্রাহ্মণ তথাকথিত 'হিন্দুধর্মবিরোধী' পশুখাদ্য গ্রহণ করেছেন, অবলীলাক্রমে চীনা খাবার খাচ্ছেন, আজ এই সময়ে ভেবে আশ্চর্য হতে হয় বই কী!

আগে বলেছি আমরা, গণিত ছিল দামোদরের প্রথম ভালোবাসা। হার্ভার্ডে তিনি অনেক বিখ্যাত গণিতজ্ঞকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। অধ্যাপক জর্জ ডেভিড বার্কহফ ছিলেন। ১৮৮৪ সালে তাঁর জন্ম। ১৯৪৪ সালে প্রয়াত হন। তিনিই প্রথম মার্কিন গণিতজ্ঞ, যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হার্ভার্ডেরই ছাত্র তিনি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অধ্যাপনা জীবন শুরু। তারপর প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। ১৯১২ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। ১৯২৫ সালে জর্জ বার্কহফ আমেরিকান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ওই সময় আমেরিকায় যাঁরা বিজ্ঞানের নানা শাখায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের সকলেই ইউরোপে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী। বার্কহফ ছিলেন প্রথম ব্যতিক্রম। তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন দামোদর। বার্কহফ ১৯২৩ সালে 'রিলেটিভিটি অ্যান্ড মডার্ন ফিজিক্স' নামে একটি বই লিখেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি 'ইসথেটিক মেজার' নামে একটি বই লিখে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বইয়ে তিনি গণিতের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ১৯৩৮ সালে বার্কহফ 'ইলেকট্রিসিটি অ্যাজ এ ফ্লুইড' নামে একটি বই লেখেন। এই বইয়ে তাঁর দর্শন ও

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে।চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও কবিতা বিষয়ে তিনি গভীরভাবে পড়াশোনা করেছেন। বিষয়ের দিকে খেয়াল করলেই আমরা বুঝতে পারি, কেন ডি ডি কোসাম্বি তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। একটি বিষয়ে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক ছিল। তিনি নাকি ইহুদি গণিতজ্ঞদের আমেরিকায় জায়গা দিতে চাননি। এই অভিযোগ তুলেছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। কেউ কেউ বলেন, স্বদেশে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী হিসেবে বার্কহফ ইউরোপের বিজ্ঞানীদের দিয়ে মার্কিন বিজ্ঞান পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিরোধী ছিলেন। বিজ্ঞান ঐতিহাসিকেরা নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট করে এই বিতর্ক বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করতে পারেন।

বার্কহফ এদিন দামোদরকে ডেকে বলেছিলেন, 'গণিতের গবেষণায় তুমি মন দাও।' দামোদর ঠিক করতে পারছিলেন না কী করবেন। বাবাকে চিঠি লিখলেন।

ডেভিড বার্কহফ

বাবা উত্তরে জানালেন, 'যেমন করে নানা বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করছ, তাই করো। একটা কোনো বিষয়ে আটকা পড়ে যেও না।' মনে সাহস পেলেন দামোদর। বার্কহফকে গিয়ে তাঁর নিজের পছন্দের কথা জানালেন। ছেলের কাছে বাবার প্রত্যাশা ছিল অনন্ত। একটা বিষয় নয়, একাধিক বিষয়ে দামোদর বিশ্বসেরা হয়ে উঠুক, এই ছিল ধর্মানন্দের চাওয়া। একটা ঘটনার কথা বললে হয়। হার্ভার্ডের এক সেমিস্টারের পরীক্ষায় দামোদর তিনটি বিষয়ে 'A' ও একটি বিষয়ে 'B' পেয়েছিলেন। বাবা জানতে পারেন। তিনটি বিষয় নিয়ে তিনি কিছু বললেন না। একটি বিষয়ে কেন 'B' পেলেন, তিরস্কার করতে ছাড়েননি। লিখলেন ছেলেকে, 'এমন যদি ফল হয়, আমেরিকায় সময় নষ্ট করে লাভ কী? দেশে ফিরে এলেই তো পার।' জেদ চাপল মাথায়। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি খেটে পড়াশোনা করলেন। পরের পরীক্ষায় এমন ফল করলেন, বাবার খুশি না হয়ে উপায় ছিল না।

ভাষার প্রতি আগ্রহ তাঁর বরাবরের। বাবার কাছে এই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। গ্রিক, লাতিন, জার্মান ও ফরাসি ভাষা তিনি আগেই জানতেন। ইতালি তখনও শেখা

হয়নি। দুটো বই পড়ে পরীক্ষা দিলেই হয়। মোট বই চারখানা। সবকটা পড়ে পরীক্ষা দিলেন দামোদর। কেমন ফল করেছিলেন? ইতালি ভাষার অধ্যাপক লিখেছিলেন, 'আমি বহু বছর ধরে ইতালি পড়াচ্ছি। এই প্রথম একজন ছাত্রকে আমি A+ দিতে পেরেছি।' দামোদর বাবার কাছে অধ্যাপকের লেখা ওই চিরকুটটি পাঠিয়ে দেন। একটিও কথা লেখেননি। দামোদরের এক প্রতিবেশী ছাত্র লিখেছেন, 'একদিন দামোদরের ঘর থেকে খুব জোর কথার আওয়াজ ভেসে আসছিল। প˜ যখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেছিলেন, একজন এসেছিল। দান্তের উপর ডক্টরেট করবে। তাকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছিলাম।' আশ্চর্য, যিনি সবেমাত্র ইতালি ভাষার পাঠক্রম শেষ করেছেন, তিনি এক গবেষক ছাত্রকে ইতালির মহাকবি দান্তের উপর কাজের উপদেশ দিচ্ছেন।

যিনি এই ঘটনার কথা লিখেছেন তিনি ছিলেন একজন নিউক্লিয় বিজ্ঞানী। একদিন কথায় কথায় দামোদরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বোরের পরমাণু ধারণার উপর আইনস্টাইনের লেখাটা পড়েছ?' জার্মান জার্নালে বেরিয়েছে। অনেকেরই পড়ার কথা নয়। জবাব শুনে ওই বন্ধু হতবাক। শুধু যে ওই লেখাটি পড়েছেন তাই নয়, আইনস্টাইনের লেখা আরও কয়েকটি নিবন্ধের কথা বললেন, যা ওই নিউক্লিয় বিজ্ঞানী পড়েননি।

তিন বছর পর ১৯২৯ সালে দামোদর 'ব্যাচেলর অফ আর্টস' (বি এ) উপাধি পেলেন। খুব ভালো ফল করেছেন। 'ফাই বিটা কাপ্পা' ক্লাবের সভ্য মনোনীত হয়েছেন।

১৯২৯ সাল। মার্কিন জীবনে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো গবেষণা প্রকল্প মঞ্জুর হচ্ছে না। অত ভাল ফল করেও দামোদর কোনো ফেলোশিপ পাচ্ছেন না। বার্কহফ চেষ্টা করেছিলেন। সফল হননি।

মে মাসে দামোদর ভারতের দিকে রওনা হন। পথে ফ্রান্স ও ইতালিতে কয়েকদিন ছিলেন। প্যারিস ও রোমে ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রির দুই খ্যাতনামা অধ্যাপক রয়েছেন। এলি কার্টন। লেভি কিভিট। ওঁদের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না।

দশ বছর আমেরিকায় থেকে দামোদর সেই সমাজের বদল নিজের চোখে দেখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছিল। [illegible] হৃতি

ঘটছিল ধনতন্ত্রের। পাশাপাশি কিছু ভয়াবহ উপদ্রবও দেখা দেয়। ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা ও জাতিবিদ্বেষ বাড়তে থাকে। সে সময় কৃষ্ণাঙ্গদের সামাজিক বোঝা মনে করা হচ্ছিল। মেক্সিকো সহ লাতিন আমেরিকার মানুষেরা দিন দিন উপহাস ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠছিলেন। এইসব দেখে দামোদর নিজের ভেতরে ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ভিন্ন সমাজের স্বপ্ন তাঁর মনে দানা বাঁধতে থাকে। ধীরে ধীরে বামপন্থী আদর্শের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। সমাজতন্ত্রের ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। লেখালেখি ও জীবনযাপনে তার বহিঃপ্রকাশ বেশ কিছুকাল পর আমরা দেখতে পেয়েছি।

## স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকলে আমাদের দেশে গবেষণার চাকুরি পাওয়া যায় না। দামোদর হতাশ হননি। ফিরে এসে দামোদর কিছুদিন ব্যাঙ্গালোরে দিদির বাড়িতে ছিলেন। দিদির বর রামপ্রসাদ এম আই টি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। তিনি দামোদরকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির দরখাস্ত করতে বললেন।

বারাণসীতে গণিতের একটি অধ্যাপক পদ ফাঁকা ছিল। দামোদর সেই চাকুরিটি পেয়ে যান। মাসে তিনশো টাকা মাইনে। থাকার জায়গা বিনে পয়সায় পাবেন। তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য উপাচার্য ছিলেন। ধর্মানন্দের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দামোদরকে তিনি তাই সন্তান স্নেহে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

যতদূর জানা যায়, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে হকি খেলতেন তিনি। মাঝে মধ্যে কাছাকাছি বেড়াতেও যেতেন। ১৯৩০ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স-এ তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়। নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যার উপর গবেষণাপত্র। গণিতের গবেষণাপত্র ছিল না। অধ্যাপনা করতেন গণিত ও জার্মান ভাষার। কিছুদিন পড়িয়ে বুঝতে পারলেন, তিনি যেভাবে গণিত শেখাতে চাইছেন, ছাত্ররা বেশিরভাগই তা চাইছে না। ওদের ডিগ্রি দরকার। ডিগ্রির পর চাকুরি দরকার। এমন পরিমণ্ডল তাঁর মনঃপূত হয়নি।

১৯৩১ সালের সাত-ই মে তিনি নলিনী মাদগাওকারকে বিয়ে করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি তাঁকে চিনতেন। কেন না, বাবা অনেকদিন নলিনীদের বাড়িতে সবাইকে নিয়ে ভাড়া ছিলেন।

আগেই বলেছি, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ভাল লাগছিল না। নতুন কিছু খুঁজছিলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? ওইসময় গণিতজ্ঞ আন্দ্রে ভাইল-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের প্রধান হিসাবে এই ফরাসি গণিতবিদ যোগদান করেছেন। তিনি পরিণত বয়সে আধুনিক গণিতবিদ্যার অন্যতম স্থপতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আন্দ্রে তাঁর বিভাগ তৈরির জন্য যোগ্য সহকর্মী খুঁজছিলেন। কলকাতায় এক সম্মেলনে দামোদরের সঙ্গে দেখা হয়।

ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ জি এইচ হার্ডির অন্যতম প্রিয় ছাত্র বিজয় রাঘবনের সঙ্গে দেখা হয়। দুজনকেই আলিগড়ে আমন্ত্রণ জানান আন্দ্রে ভাইল।

১৯৩১ সালে সংসার পেতেছেন দামোদর। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। জীবনের অন্যতম সেরা সময় তিনি এখানে কাটিয়েছিলেন। তিন মেধাবী চরিত্র গণিতের যে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলেছিলেন নিরন্তর, কারও সে জায়গা থেকে নজর এড়ায়নি। দু'বছরের মধ্যে দামোদর আটটি গবেষণাপত্র লিখেছিলেন। গবেষণার বিষয় গণিত। ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি ও পাথ্ স্পেস-এর উপর তিনি কাজ করেছেন। ইউরোপের অনেক গণিতজ্ঞের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ইণ্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে তিনি নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করেছেন।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

তাঁর পড়ানো নিয়ে ছাত্রদের উপলব্ধি এখানেও বারাণসীর ছাত্রদের মতই। খানিকটা এগিয়ে থাকা ছাত্র না হলে তাঁর পড়ানো আনন্দের মনে হতো না। অঙ্কের বাইরে একাধিক বিষয়ে গবেষণা করেছেন দামোদর। সেসব গবেষণার কথা নানা বইয়ে লিখে গিয়েছেন। পড়লেই আমরা তাঁর বহুমাত্রিক মেধার উপস্থিতি বুঝতে পারি।

ম্যাকিয়াভেলি'র 'প্রিন্স' বইয়ের কথা আমরা ছোটোবেলা থেকেই ইতিহাস বইয়ে পড়েছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধ্রুপদী গ্রন্থ। দামোদর এই বইটির মারাঠি অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। বলতে গেলে সবে অধ্যাপনা জীবন শুরু করেছেন। তখনই তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে চার হাজারের কাছাকাছি বই ছিল। বিষয়ের বৈচিত্র্য ছিল অফুরান। দামোদরের মূল লক্ষ্য থাকত নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের দিকে। সঙ্গীদের কাছে অবসর সময়ে তিনি মার্কসীয় অর্থনীতির ইতিহাস আলোচনা করতেন।

আমেরিকা ফেরত এই মানুষটির পোশাক খুব সাধারণ ছিল। শার্ট প্যান্ট আর পেশোয়ারি চপ্পল পরতেন। সকালে বাজার করতে অনেক সময় হাফপ্যান্ট পরে চলে যেতেন।

এদিকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও দীর্ণ রাজনীতির লড়াই চলছিল। লেখাপড়া ও গবেষণার পরিবেশ যথাযথ থাকছিল না। পরিচালনমণ্ডলীর ধরন-ধারণ আলিগড় আর বারাণসীতে খুব ফারাক নেই। এসব দেখে আন্দ্রে ভাইল চলে গেলেন। বিজয় রাঘবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। দামোদর একা থেকে কী করবেন?

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে দামোদর ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ র‍্যাংলার আর পি পরঞ্জপেকে একটি চিঠি দেন। চিঠির কয়েকটি লাইন আমরা পেশ করতে পারি।

'....গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন দেখা হয়েছিল, আলিগড়ের পরিস্থিতি আপনাকে জানিয়েছিলাম। গণিত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ভাইল নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছেন, কেন তিনি আলিগড়ে আর থাকতে পারছেন না। আমার পক্ষেও এখানে আর বেশিদিন থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে। আমার সামান্য কিছু দাবি বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করতে রাজি নয়। বড়দিনের ছুটিতে ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সম্মেলনে দেখা হলে আপনাকে সব কথা খুলে বলব। আমি জানি, শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে কোথাও কাজ পাওয়া ভীষণ মুশকিল। তবু আমার পরিস্থিতি বিবেচনা করে, যদি কাজের কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার কোথাও কথা বলতে যাতে অস্বস্তি না হয়, তার জন্য কয়েকটি সুপারিশ ও শংসাপত্র পাঠালাম। কোথাও যদি আপনি আমার জন্য বলতে চান, চাইব, আমার যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে বলুন। আমার বাবা কিংবা আমাকে ভালোবাসেন বলে কথা বলবেন না।' এই চিঠিতে দামোদরের যুক্তিবাদিতা ও মুক্তবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

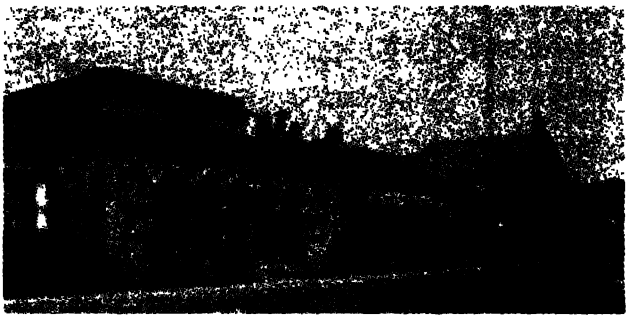

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

দু'বছর আলিগড়ে কাটিয়ে দামোদর পুনেতে ফিরে এলেন। পুনে তাঁর প্রিয়

শহর। ছোটোবেলায় অনেকগুলো বছর পুনেতে কাটিয়েছেন তিনি। নলিনীর বাবা মা-ও পুনেতে থাকেন। এখানে পাকাপাকি থাকতে পারলে ভাল হয়। একটুকরো জমি কিনে তিনি ভাণ্ডারকার ইনস্টিটিউট রোডে বাড়ি তৈরি করেন।

১৯৩৩ সালে দামোদর ফার্গুসন কলেজে গণিতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। বারো বছর তিনি ফার্গুসন কলেজে ছিলেন। মাসে ১৩০ টাকা মাইনে পেতেন। বছরের পর বছর একই বেতন। বাৎসরিক বৃদ্ধি বলে কিছু ছিল না। আলিগড়ে তিনি মাসে তিনশো টাকা পেতেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজে এসেছিলেন তিনি। সকলে তো উল্টোটাই করেন। দু'জন গণিতের র‍্যাংলার ছিলেন ফার্গুসন কলেজে। পড়াশুনো ভাল হলেও কলেজে গবেষণার আবহ ছিল না। তবু তিনি পুনে ছেড়ে যেতে চাননি। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বন্ধু অধ্যাপক সিদ্দিকি ছিলেন। তিনি দামোদরকে মোটা টাকার মাইনেতে আমন্ত্রণ জানান। দামোদর যাননি।

ফার্গুসনে পড়িয়ে তিনি কি খুশি ছিলেন? না, ছিলেন না। ওই বারোটা বছরকে তিনি 'বনবাসের বছর' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

নিজে দামোদর কোনো ছাত্রকে ডক্টরেট থিসিস করাননি। একটিমাত্র ছেলেকে করিয়েছিলেন। দু'বছরেরও কম সময় লেগেছিল। তবে বহু ছাত্র গবেষণার পরামর্শ চাইতে তাঁর কাছে এসেছে। তিনি সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছেন। ক্লাসে যখন তিনি পড়াতেন, গোড়া থেকে শুরু করতে চাইতেন। সিলেবাস ও পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে সব সময় পড়াতেন না। এমনও বলতেন, 'যা পড়াচ্ছি এক্ষুনি হয়তো কাজে লাগবে না। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।' একথা ঠিক, ছাত্ররা সাধারণভাবে তাঁর কাছে যেতে ভয় পেত। ফলে অনেকের কাছে অনেক বিষয়ে অস্পষ্টতা থেকে যেত। সূত্র সমীকরণ এসব তিনি যত্ন করে পড়াতেন। কোনো সমস্যা বা উদাহরণ ক্লাসে করাতেন না। তাঁর জবাব ছিল, 'সূত্র যদি না বোঝ, বারবার বলে দেব। সূত্র বুঝতে পারলে সমস্যার সমাধান করতে পারছ না, তার মানে তুমি সূত্রটি বোঝনি।' শিক্ষক যেমনই হোন, গবেষক হিসাবে তিনি সেই সময় খ্যাতিলাভ করেছেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'রামানুজন পুরস্কার' অর্জন করেন। ওই বছরের নোবেলয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমন ব্যাঙ্গালোরে 'ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠা করেছেন। দামোদর 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' হিসাবে মনোনীত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সাতাশ বছর।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে দামোদর চৌদ্দটি গবেষণাপত্র প্রকাশ

করেন। ১টি জার্মান জার্নালে, ২টি করে মোট চারটি ফরাসি ও ব্রিটিশ জার্নালে আর বাকি গবেষণাপত্রগুলি তিনি 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ বোম্বে ইউনিভার্সিটি', 'ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স' ও 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন অফ ম্যাথামেটিক্স্'-এর জার্নালে প্রকাশ করেছেন। খুবই উঁচুমানের সেসব কাজ। আন্দ্রে ভাইল তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

১৯৩৫ সালের ১০ই নভেম্বর তাঁর প্রথমা কন্যার জন্ম হয়। ১৯৩৯ সালের ২৪শে এপ্রিল দ্বিতীয়া কন্যা মীরার জন্ম হয়। মীরাদেবীর কথা আমরা পরে বলব।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে তাঁর লেখা প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা বত্রিশ। বারোটি গণিতের গবেষণাপত্র। বাকি কুড়িটি গবেষণাপত্র তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখেছেন। মার্কসীয় দর্শনের আলোকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিবৃত করেছেন। প্রত্নতত্ত্বের উপর গবেষণাপত্র লিখেছেন। বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেছেন।

আন্দ্রে ভাইল

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি পৃথিবীর অন্যতম সেরা মুদ্রা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই বিষয়টি তুলনায় নতুন। মুদ্রা থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনায় তিনি অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মুদ্রাবিদ্যা ইতিহাসের তথ্যকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। দামোদর এদেশে ছিলেন এই বিদ্যাচর্চার অগ্রণী পথিকৃৎ। একাধিক গবেষণাপত্রে তিনি এর পরিচয় দেন। এই বিষয়ে তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি ১৯৪১ সালের 'কারেন্ট সায়েন্স'

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুদ্রাবিদ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণাপত্রের একটি সংকলন তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে।

মারাঠি জনমানসে ভর্তৃহরির কাব্য প্রায় দৈনন্দিন চর্চার অঙ্গ। তিনি নতুন আলোকে ভর্তৃহরির সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন। 'জনতার কবি' হিসাবে তাঁকে তিনি মানতে রাজি নন। স্পষ্ট বললেন, 'ভর্তৃহরি জনগণের কবি ছিলেন না। বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি আপ্যায়িত হতেন বেশি। তাঁর অভিজ্ঞতা বাস্তব পরিস্থিতির পরিচায়ক নয়। কবীর, তুকারাম ও তুলসীদাস যেভাবে জনমানসে জায়গা করে নিতে পেরেছেন, তিনি তা পারেন নি। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির প্রতিনিধি তিনি। এই শ্রেণি বিদেশী শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতীয় সমাজকে প্রতিবাদ-বিমুখ করে রাখতে চায়। আজও সেই জিনিস চলেছে।'

ফার্গুসন কলেজ

দামোদরের রচনা 'দি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাসপেক্টস অফ ভগবত গীতা' বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে রচিত। এর জন্য নিন্দা ও প্রশস্তি দুই-ই তাঁর কপালে জুটেছিল।

তাঁর যে কাজ তাঁকে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দিয়েছিল, সেটি তিনি ১৯৪৪ সালে প্রকাশ করেন। চার পৃষ্ঠার ছোট রচনা। অসামান্য মৌলিক রচনা। রচনার শিরোনাম 'দি এস্টিমেশন অফ ম্যাপ ডিসটেন্স ফ্রম রিকমবিনেশন ভ্যালুজ'। এই প্রবন্ধ 'অ্যানাল্‌স্ অফ ইউজেনিক্‌স্'-এ প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্র থেকেই 'কোসাম্বি'জ ম্যাপ ফাংশন কথাটি এসেছে। এখন আমরা জানি, কোষের অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোজোম বংশগতির চরিত্র নির্দেশ করে। দামোদর জিনের মধ্যেকার দূরত্ব পরিমাপ করার একটি সমীকরণ উদ্ভাবন করেন। বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেন ১৯১৯ সালে একটি সমীকরণ তৈরি করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই এতকাল বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। দামোদর কোসাম্বির সূত্রটি হলডেনের সূত্রের চেয়ে বেশি কার্যকরী

হয়েছিল। 'হলডেনের ফর্মূলা' ও 'কোসাম্বির ফর্মূলা' দুইই এখন জিন গবেষকদের কাছে সমান পরিচিত।

জীববিদ্যার 'পপুলেশন জেনেটিক্স্' বিভাগের শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা হলডেনের ম্যাপিং ফাংশন ও কোসাম্বির ম্যাপ ফাংশনের সুবিধে ও দুর্বলতার দিকগুলো সহজে তুলনা করতে পারবেন। আমরা সাধ্যমত সরলভাবে বিষয়টি নীচে পেশ করব।

জিন বিদ্যায় 'ক্রসিং ওভার' বলে একটা কথা আছে। দুরকমের 'ক্রসিংওভার' হয়। *'সিঙ্গল ক্রসিং ওভার'* ও *'ডাব্‌ল্ ক্রসিংওভার'*। হলডেন *'ডাব্‌ল্ ক্রসিংওভার'* বিবেচনা করেন নি। কোসাম্বি দেখিয়েছেন, ডাব্‌ল্ ক্রসিংওভার বিবেচনা করা জরুরি। নইলে নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায় না।

*হলডেনের সমীকরণ :* $r_{AC} = r_{AB} + r_{BC} - 2r_{AB}r_{BC}$

*কোসাম্বির সমীকরণ :* $r_{AC} = r_{AC} + r_{BC} - 2Cr_{AB}r_{BC}$

কোসাম্বির সমীকরণে একটি 'C' যোগ হয়েছে। এই 'C' ডাব্‌ল্ ক্রসিংওভারের মাত্রা নির্দেশ করে। হলডেন এই মাত্রাকে উপেক্ষা করেছেন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ —এই সময়ে দামোদর নানা ধরনের লেখা লিখেছেন। তখন পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে। ১৯৩৯ সালে জে ডি বার্নাল লিখলেন, 'সোশ্যাল ফাংশন অফ সায়েন্স'। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তখন দামোদরের খুবই সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নানা বইপত্র সমালোচনা করছেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে রচনা লিখছেন। ওই সময়ে তাঁর রচনার শিরোনাম, 'দি ফাংশন অফ লিডারশিপ ইন দি পিপ্‌ল্'স মুভমেন্ট', 'লিঙ্গুইস্টিক্স্', *'প্রোডাকশন অ্যান্ড সেল অফ টেক্সটাইল্স্ ইন ইন্ডিয়া'* ইত্যাদি। তাঁর চিন্তার বিচিত্রধর্মীতা সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন হিটলারের উত্থান হল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তার ভিন্ন মূল্যায়ন করেছে।

এমনকি কংগ্রেস ব্রিটিশদের অসহযোগিতা করার আন্দোলন তৈরি করল। সোভিয়েত আক্রমণের পর কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে এই দেশের বহু বুদ্ধিজীবী সাড়া দিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে দামোদরের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় হল যে, তিনি নিয়মিত পার্টির মুখপত্রে নানা বিষয়ে নিবন্ধ

লিখতে থাকেন। জে বি এস হলডেনও একসময় ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্রে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

দামোদরের মার্কসীয় পরিচয় জানতেন বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। তবু তিনি এই মেধাবী গণিতজ্ঞকে টি আই এফ আর-এ আমন্ত্রণ জানাতে দ্বিধা করেন নি। ফার্গুসন কলেজে বারো বছর কাজ করার পর ১৯৪৫ সালে তিনি গণিতের অধ্যাপক পদে মুম্বাইয়ের এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। ভাবা তিরিশের দশকে কেমব্রিজে পড়াশুনো করেছেন। বার্নালের প্রভাব তাঁর উপরেও ছিল। তিনি দামোদরকে সেই কারণেও পছন্দ করে টি আই এফ আর-এ নিয়ে এসেছিলেন।

টি আই এফ আর-এ তাঁর মাইনে অনেকটাই বেড়ে যায়। ফার্গুসন কলেজে পেতেন ১৩০ টাকা। এখানে তিনি প্রতিমাসে ৮০০ টাকা মাইনে পেতেন। বিজ্ঞানী রমন প্রয়োজনীয় টাকা পাচ্ছিলেন না। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও প্রয়োজনীয় অর্থ পাননি। টাটা ট্রাস্টের সহাযোগিতায় ছত্রিশ বছর বয়স্ক বিজ্ঞানী ভাবা এক অসাধ্যসাধন করেছেন। এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, যা আজ এদেশে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আগে এক জায়গায় আমরা বলেছি, পুনে থেকে ট্রেনে করে নিয়মিত তিনি মুম্বাই যেতেন। শেষের পাঁচ বছর মুম্বাইয়ে বোনের বাড়িতে ছিলেন। স্ত্রী ও দুই কন্যা পুনেতে থাকতেন। সপ্তাহান্তে তিনি পুনে যেতেন।

১৯৪৫ সালে মুম্বাইয়ের 'রয়েল ইনস্টিটিউশন অফ সায়েন্স' রজত জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে দেশের তিনজন বিশিষ্ট মানুষকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানায়। হোমি জাহাঙ্গির ভাবা, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ও দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চৌত্রিশতম অধিবেশনে তিনি গণিত শাখার প্রধান বক্তা ছিলেন। নেহরুকে কোসাম্বি বিজ্ঞান কংগ্রেসের উন্নতি সাধনে কিছু দায়ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' প্রকাশিত হওয়ার পর দামোদর তার সমালোচনা প্রকাশ করেন। কিছু বিষয়ে নেহরুর যে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছিল, সেকথা লিখতে তিনি ভোলেন নি।

দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতার পূর্ণতা নিয়ে ওই সময় নানা বিতর্ক হয়েছে। ভাবা ঠিক করলেন, দেশের বিজ্ঞান পরিকাঠামোকে উন্নত ও সমকালীন করে গড়ে তুলতে হবে। তা চাইলে কম্পিউটার প্রয়োজন। এই বিষয়ে যথেষ্ট

প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিজ্ঞানী ভাবা দামোদরকে 'ইউনেস্কো ফেলোশিপ' দিলেন। এই ফেলোশিপ নিয়ে দামোদর ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যান। ১৯৪৬-৪৯ সাল তিনি বাইরে ছিলেন। ইংল্যান্ডে ভারততত্ত্ববিদ এ এল ব্যাশমের সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই পরিচয় বহুকাল সজীব ছিল। আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দামোদর কিছুকাল 'অতিথি অধ্যাপক' ছিলেন। ওখানকার ছাত্রদের জ্যামিতি পড়িয়েছেন। নিজে কম্পিউটারের খুঁটিনাটি শিখেছেন।

প্রিন্সটনে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা বলেন। দামোদর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। সেই নিয়ে দু'জনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। আইনস্টাইনের সমাজ ভাবনা তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। তিনি সেই সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আজীবন বয়ে বেড়িয়েছেন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সবচেয়ে বড় কথা, এম আই টি-তে অধ্যাপক নর্বার্ট ভাইনার তাঁকে কাছে পেয়ে কিছুতেই ছাড়তে চাননি।

দেশে ফিরে দামোদর গবেষণার পাশাপাশি বিশ্বশান্তি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। বিশ্বশান্তি পরিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। নিউক্লিয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অপ্রচলিত শক্তির প্রসারে তিনি ছিলেন এক নিরলস যোদ্ধা। শক্তির সংকট ও সমাধানের প্রশ্নে তাঁর ভাবনা ভারতীয় শাসকশ্রেণিকে খুশি করতে পারেনি। সৌরশক্তির গবেষণায় জোর দিতে তিনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে উচ্চারণ করেন। তাঁর একটি লেখার শিরোনাম ছিল 'অনুন্নত বিশ্বে সৌরশক্তি'। শান্তি আন্দোলনের বিশ্ব সৈনিক হিসাবে পৃথিবীর একাধিক শান্তি সম্মেলনে গিয়েছেন। বেজিং, হেলসিঙ্কি ও মস্কো গিয়েছেন।

১৯৫৬ সালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপর তাঁর লেখা 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি' বইটি প্রকাশিত হয়। মার্কসীয় দর্শনে সঞ্জীবিত ইতিহাস। ভারতের বস্তুবাদী ঐতিহাসিকদের কাছে এই বই অন্যতম নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হয়।

চিন দেশে তিনি বহুবার গিয়েছেন। চিনের সামাজিক অগ্রগতির ধারা নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতের পরিকল্পনায় দুর্বলতা কোথায়, এই নিয়ে চিন দেশের সঙ্গে তুলনা করে তির্যকভঙ্গীতে তিনি একাধিক নিবন্ধ রচনা করেছেন। বিজ্ঞানী ভাবা শাসকশ্রেণির সঙ্গে দামোদরের এমন তীক্ষ্ণ বিরোধিতা মেনে নিতে পারেন নি। ফলে ১৯৬২ সালে দামোদর এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেন।

১৯৬২ সালের পর তিনি ভারতেতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৫ সালে বিখ্যাত 'Routledge' প্রকাশন সংস্থা থেকে তাঁর 'দি কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া' বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটি জার্মান ফরাসি ও জাপানি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' জার্নালে মুদ্রা বিজ্ঞানের উপর তাঁর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট ভারতীয় গবেষকদের অনুরোধে দামোদর ১৯৬৪ সালে সি এস আই আর-এর 'এমিরেটাস সায়েন্টিস্টস্' পদ গ্রহণ করেছিলেন। তবে ওই সময়ের বহু কাজ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করা যায়নি।

১৯৬৬ সালের ২৯শে জুন পুনেতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ৯ই জুলাই পুনে শহরের অধিবাসীরা কোসাম্বির স্মৃতিতে একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। সভা থেকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, তাঁর স্মৃতিতে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। স্মারকগ্রন্থ কমিটির সভাপতি ছিলেন ভারতের অন্যতম ভাবী রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি। ১৯৭৪ সালে 'সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান প্রগ্রেস' শিরোনামে স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগেও একটি স্মারক সমিতি গঠিত হয়েছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এল. গোপাল ও অন্যান্যদের যৌথ সম্পাদনায় ১৯৭৭ সালে এই সমিতির পক্ষ থেকে ডি ডি কোসাম্বি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পর ১৯৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাঁকে মরণোত্তর 'হরি ওঁ আশ্রম' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

দামোদরের লিখিত ও সম্পাদিত বইয়ের তালিকা দীর্ঘ। এমনকি তিনি ছোটদের জন্য 'দি হাম্প অন নন্দী'জ ব্যাক' নামে একটি গল্পও লিখেছেন। সব মিলিয়ে তাঁর গবেষণাপত্র ও নিবন্ধাবলীর সংখ্যা দেড়শোর কাছাকাছি। ভারতের ইতিহাস কেমন চোখে দেখতে হবে এই নিয়ে দামোদরের অভিমত মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন জে ডি বার্নাল। দামোদরের বৈজ্ঞানিক বীক্ষাকে বিশিষ্টতা দান করেছেন। বার্নালের 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি' বইয়ে কোসাম্বির কথা একাধিক জায়গায় উল্লিখিত রয়েছে।

'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি' বই থেকে আমরা সরাসরি বার্নালের লেখা উদ্ধৃত করব। বাংলায় অনুবাদ করব না।

... It is in fact very much more difficult to see a problem

than to find a solution for it. The former requires imagination, the latter only ingenuity. This is the sense of Kosambi's definition of science as the cognition of necessity.

Science in History
Volume–I
The Emergence of Science
Page – 39

বার্নালের রচনা থেকে ঐতিহাসিক কোসাম্বি বিষয়ে আরও একটি সপ্রশংস উক্তি আমরা নিবেদন করব।

For India, with its confused history and traditional reluctance to chronicle precisely, the task will be much harder and it only in fact beginning. In this connexion I have drawn of Professor D. D. Kosambi's history on Indian Culture, which to my mind, at any rate, is the first account that begins to make sense.

Science in History
Volume — I
The Emergency of Science
Page – 348

লেখা শেষ করার আগে একটা মজার (?) কথা বলব। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার কয়েকদিন আগে দামোদরের বাবা ধর্মানন্দ কোসাম্বি মারা যান। বাবা ও ছেলে দু'জনেরই নাম ডি ডি কোসাম্বি। এই মৃত্যু সংবাদ হার্ভার্ডে পৌঁছায়। নাম দেখে সকলের মনে হয়, গণিতের ছাত্র কোসাম্বি বেঁচে নেই। তখন প্রাক্তনী ছাত্র সমাজ একটা শোকসভার আয়োজন করে। পুনেতে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় সেই শোক প্রস্তাব পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অনেকদিন পর হালকা মেজাজে দামোদর লিখেছিলেন, '১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুন আমার মৃত্যুদিন হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। দিন ও তারিখ নির্ভুল হতে পারে। বছরটা কিছুতেই নির্ভুল নয়। বন্যার হাত থেকে কাগজপত্র বাঁচাতে গিয়ে ১৯৬১ সালে আমি শোক প্রস্তাবটি খুঁজে পাই। এ থেকে প্রমাণিত হয়, আমি কমপক্ষে বেঁচে আছি।'

ভারততত্ত্ববিদ এ এল ব্যাশম তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'শুরুতে

আমার মনে হয়েছিল, তিনটি বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ। প্রাচীন ভারত, গণিত ও বিশ্বশান্তি। এই তিনের জন্য তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের অন্ত নেই। যখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হল, আমি বুঝতে পারি, তিনি কত বড় মনের মানুষ। অতীতের ইতিহাস নির্ভুলভাবে সাজাতে তিনি নৃতত্ত্ববিদ্যার সাধনা করছেন। আমার কাছে স্পষ্ট হল, মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি রয়েছে।'

এ এল ব্যাশম

খুব অল্প কথায় আমরা এ এল ব্যাশমের পরিচয় দিতে চাইছি। তাঁর পুরোনাম আর্থার লেভেলিন ব্যাশম। ১৯১৪ সালের চব্বিশে মে তাঁর জন্ম। কোসাম্বির চেয়ে তিনি সাত বছরের ছোট ছিলেন। ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যসভ্যতা (পরে এশিয় সভ্যতা) বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আধুনিককালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৮৫ সালে তিনি কলকাতায় আসেন ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক 'স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপক পদ' গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ সালে কলকাতা শহরেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

১৯৫৪ সালে লেখা তাঁর বই 'The Wonder That was India' প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ২০০১ সালে বইটির সায়ত্রিশতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও দর্শন বিষয়ে একাধিক বই রচনা করেছেন।

ডি. ডি. কোসাম্বির সারা জীবনের কাজ মানুষের প্রতি গভীর প্রীতির পরিচায়ক। জন্মশতবর্ষে নানাভাবে তিনি আলোচিত হোন, এই আমাদের চাওয়া। ভারতীয় সমাজ যতদিন না অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণ সমর্থ হচ্ছে, তিনি আলোচিত হোন, এই আমাদের চাওয়া।

# বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমাজ : কোসাম্বির চিন্তাসূত্র

আমাদের দেশে 'সেতুসমুদ্রম আখ্যান' নিয়ে দক্ষযজ্ঞ কান্ডকারখানা চলছে। বড় আকারে আলোচনা হচ্ছে ভারত মার্কিন পরমাণু চুক্তি নিয়ে। এই দুই বিষয়ের আলোচনায় যাঁর ভাবনা ও লেখালেখির দিকে সকল সময়ে আমরা তাকাতে পারি ও করণীয় কাজ নির্বাচন করতে পারি, তিনি দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি। অথচ বলতে বাধা নেই, তাঁর জন্মশতবর্ষ সদ্য উত্তীর্ণ হলেও তিনি প্রত্যাশামত আলোচনার অঙ্গনে আসেননি।

কোসাম্বির কথা বলতে গেলেই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার দিকে তাকাতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ তাঁকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষক হিসেবে চেনেন। সঠিকভাবেই চেনেন। সেতুসমুদ্র বানরকুলের তৈরি — এই শব্দবন্ধ উচ্চারণ করে যারা আসমুদ্রহিমাচল এই একবিংশ শতাব্দীতেও লম্ফঝম্ফ করছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা রচনার দর্শন আমরা কোসাম্বির 'মিথ অ্যান্ড রিয়েলিটি' বই থেকে পরম নিশ্চিন্তে সংগ্রহ করতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথা। কলেজে যেই অধ্যাপকের কাছে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠগ্রহণ করেছিলেন, সেই অধ্যাপক ভারতীয় মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আধুনিক উদ্ভাবনা প্রত্যক্ষ করতেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বিজ্ঞানী সাহা 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকায় এই মোহমুগ্ধতা সংবরণের পরামর্শ পেশ করেছেন। এছাড়া মেঘনাদ সাহার লেখা 'সবই ব্যাদে আছে' রচনাটি তো বাংলা বিজ্ঞান নিবন্ধের সেরা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে।

কোসাম্বির প্রধান পরিচয় ঐতিহাসিক হলেও মনে রাখতে হবে, তাঁর ছাত্রজীবনে পড়াশুনোর মুখ্য বিষয় ছিল গণিত। গণিত প্রতিভার পরিচয়ে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দ্রে ভাইলের মত বিশিষ্ট গণিতজ্ঞের সহকর্মী হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন। পুনের বিখ্যাত ফার্গুসন কলেজে পড়িয়েছেন। এমনকী বিজ্ঞানী ভাবার আমন্ত্রণে যখন 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ' এ যোগদান করেন, গণিতের গবেষক হিসেবেই তিনি কাজ

করেছেন। মানুষটির পাঠক্রম নির্ভর জীবিকা গণিতের বৃত্তে সীমাবদ্ধ হলেও সৃষ্টির জগতে তিনি গণিতের পাশাপাশি ইতিহাস ভাবনাকে জায়গা দিয়েছিলেন। হয়তো অনেকেই মানবেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব পূরণচাঁদ যোশীর সান্নিধ্যে তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যার বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃতি অনেক বেশি পল্লবিত হয়েছে। ইতিহাসের এমন বিশ্লেষণ যে ভারতীয় সমাজ পরিবর্তনে জরুরি, এই প্রত্যয় কোসাম্বি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ও গণিতজ্ঞ কোসাম্বি ছিলেন পৃথিবীর শান্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। এই কাজে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ও চীনে বহুবার গিয়েছেন। মুদ্রাবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা আন্তর্জাতিক খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিল। 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' প্রধানত জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার সাময়িকী। মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ সেখানে সাধারণত প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যাঁরা এক একটি বিষয়ের বিশ্বসেরা হিসেবে বিবেচিত, তাঁরাই আমন্ত্রণ ক্রমে তাঁদের নিজস্ব বিষয়ের উপর জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা তৈরি করে দেন। ১৯৬৬ সালে ডি. ডি. কোসাম্বির লেখা একটি প্রবন্ধ ওই কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। লেখার শিরোনাম 'সায়েন্টিফিক নিউমিসম্যাটিক্স্'। ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ১৩ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। মুদ্রা যে শুধুমাত্র অর্থনীতিতে বিনিময় প্রথার প্রতিনিধিত্ব করে তাই নয়, ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানেরও সাক্ষ্য দেয়। মুদ্রার উপাদান বিশ্লেষণ করে আমরা ওই আমলে ধাতুবিদ্যা ও ধাতুনিষ্কাশন প্রযুক্তিবিদ্যা কতটা অগ্রবর্তী ছিল, তা-ও খুঁজে বার করতে পারি।

তাঁর লেখা তিনটি বইয়ের কথা মাঝে মধ্যেই আমাদের আলোচনায় উঠে আসে। ১৯৫৬ সালে লেখা 'An Introduction to the Study of Indian History', ১৯৬২ সালে লেখা 'Myth and Reality : Studies in the Formation of Indian Culture' এবং ১৯৬৫ সালে লেখা 'The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline'। তিনটিই ইতিহাসের বই। এর বাইরে কিছু প্রবন্ধের সংকলন রয়েছে। যেমন, ১৯৫৭ সলে প্রকাশিত হয়েছে Exasperating Essays : Exercise in the Dialectical Method'। ২০০২ সালে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'D. D. Kosambi : Combined Methods in Indology and Other Writings'। বইগুলোর বিষয়ে পরে আমরা আলোচনা করব।

কোসাম্বির ইতিহাস বিশ্লেষণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিশ্চয় অনেক বেশি লেখা হবে। গণিতে তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিষয়গত কারণেই সর্বজনবোধ্য করে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। আমরা সেই চেষ্টা করব না। তবে তাঁর বহুল পরিচিত 'কোসাম্বি'স ম্যাপ ফাংশন'-এর কথা অবশ্যই বলতে হবে। জিন ম্যাপিং-এর কাজে বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেনের একটি গাণিতিক ফাংশন রয়েছে। কিন্তু কোসাম্বির ম্যাপ ফাংশন তুলনায় অধিকতর নির্ভুল উত্তর পেতে সহায়তা করে। পৃথিবীর সকল দেশে যারা জেনেটিক্স্-এর গবেষক, বিভিন্ন জীবপ্রজাতির পারস্পরিক দূরত্ব নির্ধারণে কোসাম্বির ম্যাপ ফাংশন কাজে লাগান। বেশিদিন আগের কথা বলছি না। ২০০৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে আমাদের দেশেব. বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক পার্থ মজুমদার একটি অনুষ্ঠানে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তার শিরোনাম ছিল, 'Where do we come from? A Statistical–genetic traceback'। 'পপুলেশন জেনেটিক্স্'-এর কথা বলছিলেন অধ্যাপক মজুমদার। সেখানে তিনি বললেন, অধ্যাপক ডি. ডি. কোসাম্বির 'কোসাম্বি'জ ম্যাপ ফাংশন' কাজে লাগিয়ে আমাদের দেশ থেকে আমরা অণুপ্রজাতিবিদ্যার (মলিকুলার জেনেটিক্স্) অনে ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করতে পেরেছি।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমাজ প্রসঙ্গে ডি. ডি. কোসাম্বির লেখা বেশ কিছু প্রবন্ধ রয়েছে। এই রচনায় আমরা মুখ্যত সেইসব প্রবন্ধের বিষয়গুলোই পেশ করব। বুঝতে চাইব, কোসাম্বির অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা। দেশ ও সমাজগঠনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকাকে তিনি কেমন চোখে দেখতেন তার স্পষ্ট একটা ছবি আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। তবে এই আলোচনায় যাবার আগে আমরা তাঁর বিজ্ঞান গবেষণাপত্রগুলোর একটা হিসেব দেখে নিতে চাইছি। আগেই বলেছি আমরা, সিংহভাগ গবেষণাপত্র গণিতের নানা বিষয়ে তিনি রচনা করেছেন।

| *বছর* | *গবেষণাপত্রের সংখ্যা* |
|---|---|
| ১৯৩০ | ১ |
| ১৯৩১ | ১ |
| ১৯৩২ | ৫ |
| ১৯৩৩ | ৩ |
| ১৯৩৪ | ৩ |

| *বছর* | *গবেষণাপত্রের সংখ্যা* |
|---|---|
| ১৯৩৫ | ৩ |
| ১৯৩৬ | ৩ |
| ১৯৩৮ | ২ |
| ১৯৩৯ | ১ |
| ১৯৪০ | ৩ |
| ১৯৪১ | ৩ |
| ১৯৪২ | ১ |
| ১৯৪৩ | ১ |
| ১৯৪৪ | ৩ |
| ১৯৪৫ | ১ |
| ১৯৪৬ | ২ |
| ১৯৪৭ | ২ |
| ১৯৪৮ | ১ |
| ১৯৪৯ | ২ |
| ১৯৫১ | ২ |
| ১৯৫২ | ২ |
| ১৯৫৪ | ২ |
| ১৯৫৮ | ২ |
| ১৯৫৯ | ২ |
| ১৯৬৩ | ১ |
| ১৯৬৬ | ১ |

সবশেষ রচনাটি 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' এ বেরিয়েছিল, যার কথা আগে আমরা উল্লেখ করেছি। এই রচনার তালিকায় একটি রচনার বিষয় খুবই আকর্ষণীয়। রচনার শিরোনাম 'সিজনাল ভেরিয়েশন ইন দি ইন্ডিয়ান ডেথ রেইট'। রচনাটি 'অ্যানাল্‌স্ অফ হিউম্যান জেনেটিক্‌স্ (১৯৫৪)-এ বেরোয় (Annals of Human Genetics, 19 (2) 100–119)। সহলেখক ছিলেন এস. রাঘবচারী। এবার আমরা তাঁর নিবন্ধগুচ্ছের দিকে যাই।

পৃথিবীতে উন্নতদেশগুলোতে যেভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকশিত হয়েছে, উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশে সেভাবে বিকশিত হয়নি। এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করেছিলেন ডি. ডি. কোসাম্বি। রচনার শিরোনাম 'প্রব্লেম্‌স্ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন আন্ডার ডেভলপ্‌ড্ কানট্রিজ'। শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা প্রধানত তিনটি শর্তের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক শর্ত। অর্থনৈতিক শর্ত। সামাজিক শর্ত। তারপর-ই বলেছেন, বিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট গন্ডি নেই। আরবীয় বিজ্ঞান বা আরবীয় বীজগণিত সকলের। 'আফ্রিকীয়' রসায়ন বা 'এশীয়' প্রযুক্তিবিদ্যা বলার কোন মানে হয় না। গন্ডি নেই বলেই দেশীয় অবস্থানের উপর তার বিকাশ নির্ভরশীল। আর দেশীয় অবস্থান উপরিউল্লিখিত তিনটি শর্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর লেখা থেকেই বলছি।

'রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অধিকাংশ গরিবদেশ দীর্ঘকাল উপনিবেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। অনুন্নত দেশ হিসেবে পড়ে থাকার এটি একটি মুখ্য কারণ। কাজেই প্রথমে স্বাধীনতা চাই। বললেই তো আর অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক-এ বিজ্ঞান প্রযুক্তি গড়ে উঠবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আরও জটিল। প্রকৃত আফ্রিকীয় নাগরিকেরা তাঁদের জন্মভূমিতে কোনই অধিকার ভোগ করতে পারেন না। সেদেশের নাগরিক হিসেবেও তাঁরা গণ্য নন। সম্পদ লুণ্ঠনকারী শ্বেতকায় মানুষগুলো লন্ডন শহরে মুনাফা বিনিয়োগ করছে। রোডেশিয়ার ছবিটাও একইরকম।

বুঝতেই পারছেন পাঠক, আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষাপট থেকে কেমন অসামান্য বিশ্লেষণ ভঙ্গী আয়ত্ত করেছিলেন ডি. ডি. কোসাম্বি।

সচেতনভাবেই লিখেছিলেন তিনি, 'জানি, এই রচনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা বলা দরকার। কিন্তু উপরের পরিস্থিতি আলোচনা না করে বিজ্ঞান প্রযুক্তির কথা বলব কেমন করে?'

রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলতে হয়। 'অনুন্নত' বলতে সাধারণ মানুষ অর্থনীতির কথাই বুঝেন। অনুন্নত দেশ বলতে কতগুলো জিনিস আমরা আগাম ধরে নিই। বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট নেই। কলকারাখানা, রেলপথ, জলবন্দর, এসব যথেষ্ট পরিমাণে নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যেরও অভাব। থাকবার ঘরবাড়ি নেই সকলের। সকলের যে এমন অবস্থা থাকা উচিত ছিল, এমনটা নয়। আরবের অনেক দেশ রয়েছে যাদের মাটির নীচে প্রচুর তেল

সম্পদ লুকিয়ে আছে। তবে এই সম্পদ কাজে লাগানো হবে কী হবে না, তা দেশীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিদেশিরা যদি সম্পদের সিংহভাগ নিয়ে চলে যায়, দেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ইরানে বহু বছর ধরে এমনটাই চলছে। এছাড়া যারা শাসনক্ষমতায় রয়েছে তাদের নিজেদের ও পরিবার পরিজনদের ঐশ্বর্য না বাড়িয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। আরব্য উপন্যাসের মত আরব্যরজনী অতিবাহিত করলে যত সম্পদ-ই থাকুক, দেশের মানুষের কোন উপকার হবে না। কাজেই সম্পদ থাকলেও আমাদের দেখতে হবে পরিকল্পনা কারা করছেন। কাদের জন্য করছেন।

তাঁর প্রবন্ধে আলাদা করে একটি পংক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আমরা মূল ভাষাতেই তা লিখছি।

'Under developed countries need a planned course of development, which necessarily implies a planned economy' (নিম্নরেখ লেখকের)।

তারপর-ই তিনি লিখেছেন, যতই পরিকল্পনাই থাকুক, দেখতে হবে, কার জন্যে কারা পরিকল্পনা করছেন। একটা ঝোঁক দেখতে পাই। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়। যত ইচ্ছেই থাকুক, ওভাবে হয় না। বিদেশিরা যে পরিবেশে বড় হন, তা আলাদা। যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেন, তা আলাদা। স্থানীয় মানুষজনের চাহিদা রুচি ও সংস্কৃতির বিষয়ে এদের জ্ঞানগম্যি থাকে না, বোঝবার আগ্রহও দু'একজন ছাড়া বিশেষ কারও দেখা যায় না। বিদেশি বিশেষজ্ঞরা কোন না কোন কোম্পানির জিনিসপত্র বিক্রি করতে আসবেন।

আমাদের দেশের একটা উদাহরণ খুবই চমৎকারভাবে পেশ করেছেন লেখক। দেশের যে সমবায় কারখানাগুলো থেকে চিনি উৎপাদিত হয় সেখানে আগের ছিবড়াগুলো সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়। জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানো হয়। একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞ, যিনি সজ্জন, বললেন, এগুলো পুড়িয়ে ছাই করে লাভ কি? ছিবড়া কাজে লাগিয়ে কাগজ তৈরি করা যেতে পারে। মোম, তেল এসবও তৈরি করা যেতে পারে। সত্যি বলতে কী, এসব কথা আমাদের ভারতীয় রসায়নবিদেরাই অনেককাল আগে বলেছেন। এর জন্যে বাইরের বিশেষজ্ঞের দরকার ছিল না। সমস্যা অন্যখানে। চিনির কোম্পানিগুলোকে কাগজ তৈরির কল খুলতে হবে।

ছিবড়া কাজে লাগাতে হবে। অর্থনীতির কারণে একাজ সহজে হচ্ছে না। প্রথমত কাগজের কল তৈরি করতে গেলে তার মেশিন বাইরে থেকে আমদানী করতে হবে। দ্বিতীয়ত জ্বালানি হিসেবে ছিবড়া কাজে না লাগালে বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে। তেলের ভীষণ দাম। যেখানে চিনির কারখানা বেশি, সেখানে গ্যাসের সুযোগ কম। কয়লা আনতে হলে পরিবহণ খরচ লাগবে। হাঙেরি থেকে বিশেষজ্ঞ এসে বললেন, ছিবড়াকেই জ্বালানির কাজে লাগানো হোক। তবে তার আগে আরও অনেক উপাদান নিষ্কাশন করে নেয়া হোক। গাঁজিয়ে গ্যাস তৈরি করা হোক। সেই গ্যাস দিয়ে জ্বালানি হবে। বাকি অবশেষ সার হিসেবে জমিতে দেওয়া যেতে পারে। বছরের পর বছর ধরে রাসায়নিক সার দিয়ে জমির তথৈবচ চেহারা দাঁড়িয়েছে। এ থেকেও খানিকটা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

তারপর কোসাম্বি যা বললেন তা প্রণিধানযোগ্য। এমন পরিকল্পনা রচিত হল বটে কিন্তু বাস্তবায়িত হল না। তার কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক। যাঁরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী তাদের মস্তিষ্কে অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এখনও আমরা ছিবড়া পুড়িয়ে যাচ্ছি।

লেখক যা লিখেছেন, প্রতিটি লাইন বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। নইলে নিবন্ধের মধ্যিখানে যোগ করতেন না, 'সমস্যাগুলোই বললাম, সমাধান কিছু দিতে পারিনি।' আরও বললেন, 'আমি চাই, প্রতিটি অনুন্নত দেশে সঠিক রাজনৈতিক পরিকাঠামো ও নির্ভুল বিদেশনীতি গড়ে উঠুক। ....আমরা অনেকেই জানতে চাই না, কেন আমরা অনুন্নত। বাইরে থেকে টাকা আনছি, বিশেষজ্ঞ আনছি। আমাদের সম্পদ ও আমাদের বাজার পুরো বিদেশিদের অধীনে চলে যাচ্ছে। এখানে শ্রমের মজুরি কম। পণ্য তৈরি করে মুনাফার পরিমাণ সহজেই বাড়ানো যায়। আমাদের সম্পদ হরণ করে পৃথিবীর উন্নত দেশ সম্পদশালী হয়েছে। আমরা তাদের কাছে গিয়ে হাত পাতছি। ...নিউ ইয়র্ক, লন্ডন বা প্যারিসে যে পরিকল্পনা রচিত হয় তা মুম্বাই, কলকাতা ও দিল্লিতে হয়তো বা চলতে পারে। শহরের কয়েক মাইল ভেতরে গেলেই বোঝা যায়, ছবিটা কত আলাদা। আমাদের উন্নয়ন সব জায়গায় একরকম নয়।

অশিক্ষা রয়েছে। কারিগরিবিদ্যার অপ্রতুলতা রয়েছে। পরিবহণ, টেলিফোন, চলচ্চিত্র, বেতার, দূরদর্শনের অনুপস্থিতি — বিদেশে প্রশিক্ষিত লোকজন এসব

সমাধানের বাইরে বলেই বিবেচনা করবেন। দেশের ভেতরকার প্রচলিত পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে, গ্রামীণ মানুষকে যুক্ত করে পরিকল্পনা রচনার কোন ছবি দেখা যায় না। এই নিবন্ধে ডি. ডি. কোসাম্বি 'Organisation without burcaucracy' তৈরির কথা বারবার বলেছেন। প্রকৃত উন্নয়নের জন্য আমলাতান্ত্রিকতা মুক্ত সংগঠন গড়ার কথা বলেছেন।

'শক্তি' বিষয়ে ডি. ডি. কোসাম্বির খুবই জোরালো অভিমত ছিল। দেশীয় পরিকল্পনার শ্লথতা যেমন উচ্চারণ করেছেন, বিকল্পের প্রস্তাবনাও পেশ করেছেন। তাঁর লেখা থেকেই উল্লেখ করছি।

'আমাদের দেশে খুবই উঁচুমানের পদার্থবিদেরা রয়েছেন। আমাদের পরমাণু শক্তি বিভাগ প্রতিবছর কয়েকশো মিলিয়ন টাকা ব্যয় করছে। কিন্তু আমাদের দেশ কতটা পরমাণু শক্তি তৈরি করছে? ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। ১৯৬৮ সালের আগে নাকি কাজ শুরু হবে না। এই যে দেরি, কেউ সমালোচনা করছেন না। রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ আবার পরমাণু বোমা তৈরির নেশায় মত্ত হয়ে রয়েছেন। বিদেশি বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করেছি। এখন সেকেলে হয়ে পড়েছে প্রায়। যে কোন দেশে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরির যা খরচ, অমাদের খরচ তার চেয়ে বেশি। চিরাচরিত শক্তির উৎস নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। 'গবেষণা'র প্রাথমিক ব্যয় সব কাটছাঁট হয়ে যাবে।...আমাদের দেশের অর্থনীতিতে পরমাণু বিদ্যুৎ কি মানানসই? সৌরশক্তির দিকে আমরা বিন্দুমাত্র নজর দিচ্ছি না। পাঁচ থেকে দশ হর্স পাওয়ারের পাম্প সৌরশক্তি দিয়ে চালিয়ে আমরা কৃষিতে বিপ্লব সম্পাদন করতে পারি।

আমাদের পরিকল্পনামন্ত্রক সম্পর্কে কোসাম্বি কী ধারণা পোষণ করতেন?

'Our planning commission writes excellent philosophical discourses, completely futile when it comes to effective translation into useful practice'.

দেশের বাঁধ তৈরি পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন কোসাম্বি। সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন।

বাঁধ যদি খুব বড় হয়, প্রচুর টাকা লাগবে। খুব ছোট হলে যে কোন সময় শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যেখানে যেমন বৃষ্টিপাত হয়, তার পরিমাণ বুঝে

নিয়ে বাঁধ তৈরি করলে ভাল হয়। এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হল। ভার এসে পড়ল তাঁর উপর। তিনি বললেন, বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ আর. এ. ফিশারের পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে সহজে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। নানা জায়গা থেকে কোসাম্বি পরিসংখ্যান চেয়েপাঠালেন। দেখে বুঝতে পারলেন, এগুলো নিজেদের মনগড়া। কোন কোন বছরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাযথ নথিবদ্ধ করাও হয়নি। আগের বছর আর বেশ কয়েক পরের বছরের পরিমাণ ছিল। লেখচিত্রে বিন্দু বসিয়ে লাইন টেনে ফাঁকা বছরগুলোর মান বসানো হয়েছে। এমনটা হয় নাকি? ছোট বাঁধ এমনিতে বিদ্যুৎ তৈরির পক্ষে খুব কাজের নয়। তবে কৃষিপ্রধান দেশে তার উপযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব বাঁধ মাটি ক্ষয় রোধ করে। ছোট বাঁধ তৈরিতে স্থানীয় মানুষজনকে সহজে জড়িয়ে নেয়া যায়। তাঁদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো সহজ হয়। বড় বাঁধের জোর বিরোধিতার কথা তিনি কোথাও উচ্চারণ করেননি। তবে ছোট বাঁধের পক্ষে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সবশেষে বলব, এই নিবন্ধ কলকাতা শহরের একটি প্রকাশন সংস্থা থেকে ১৯৬৫ সালের মে মাসে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমরা এবার যে নিবন্ধটির কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য স্বল্পপরিসরে আলোচনা করব তা ১৯৫৩ সালে 'বিজ্ঞান-কর্মী' সাময়িকীর চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (অক্টোবর, ১৯৫৩, পৃঃ৫-১১)। একদশক পর ১৯৬২ সালে বিখ্যাত 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (Monthly Review, New York, vol 4, 1962, pp 200-205)। নিবন্ধটির শিরোনাম 'সায়েন্স অ্যান্ড ফ্রিডম'।

বিজ্ঞানচর্চায় স্বাধীন আবহ অপরিহার্য। যুদ্ধের সময় যেসব বড়মানের উদ্ভাবনা দেখা গিয়েছে, স্বাজাত্যবোধের অহঙ্কার ও স্বাধীনতাস্পৃহাই সেসব উদ্ভাবনায় সহযোগিতা করেছে। কোসাম্বি লিখেছেন, ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুকাল পরে, মার্কিন বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ খুব সহজ। বিজ্ঞান গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান বড় বড় বহুজাতিক ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে অব্যাহত থাকবে তো? কোসাম্বি ওইসব বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণী প্রতিভা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানচর্চাকে 'বিশুদ্ধ ও স্বাধীনচর্চা' হিসেবে অভিহিত করতে চান, কোসাম্বি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের যুগে বিজ্ঞানীর ভূমিকাকে কেউ কেউ নগণ্য বিবেচনা করতে চাইছেন। এক

বৃহত্তর ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম এক অংশ বলতে বিজ্ঞানীদের বোঝায়। একথা হয়তো ঠিক যে এখনকার বিজ্ঞানীরা ফ্যারাডের চেয়ে সুখে আছেন। সামাজিক ও দার্শনিক বিপদের দিকে না তাকিয়ে বিজ্ঞানীদের এখন নিয়মিত পেটেন্টযোগ্য সামগ্রী উদ্ভাবন করতে হয়। প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপিত করতে হয়। কোসাম্বি লিখলেন, 'আমেরিকায় এখন এক বিচিত্র আবহ। ডাইনি খোঁজার মত 'কমিউনিস্ট' অনুসন্ধান চলছে। প্রতারক বা দস্যুদের চেয়ে এদের অপরাধ বেশি বলে গণ্য হয়।'

যে কেন্দ্রীয় বার্তা কোসাম্বি উল্লিখিত নিবন্ধে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন, তা হল এই —

'Freedom is the recognition of necessity ; science is the cognition of necessity'. এই দুটি বাক্যের প্রথম অংশটি স্বাধীনতার মার্কসীয় সংজ্ঞা হিসেবে সকলের কাছে সুপরিচিত। দ্বিতীয় বাক্যটি কোসাম্বি যোগ করেছেন। যোগ করার সপক্ষে কোসাম্বি যথাযথ উদাহরণ পেশ করেছেন।

কোসাম্বির কথা থেকেই বলছি। এক সময় শোনা যেত, ভারতীয় যোগীপুরুষেরা নাকি যোগ বলে শূন্যে উঠতে পারতেন। শূন্যে ভেসে থাকতে পারতেন। কোসাম্বি অবশ্য একথা বিশ্বাস করতেন না। তথ্যটাকে সামনে রেখে তিনি বললেন, ধীরে ধীরে বায়ুগতিবিদ্যা ও বায়ুযন্ত্রযানের চর্চা বিকশিত হয়েছে। উড়োজাহাজ তৈরি হয়েছে। অর্থ থাকলেই যে কেউ উড়োজাহাজে চড়ে একদেশ থেকে অন্যদেশে যেতে পারেন। কোসাম্বি যে কথা বলে সিদ্ধান্ত টানলেন, 'আসল প্রশ্ন হল, উড়তে আগ্রহী মানুষটির অর্থ রয়েছে কিনা। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উড়ান প্রক্রিয়াটি যুক্ত হয়ে গিয়েছে। এখনও কি কেউ দুখানা ডানা লাগিয়ে উড়তে চাইতে পারে না? কেউ কি 'যোগী' হবার চেষ্টা করতে পারে না? 'স্বাধীনতা' তো রয়েছেই। প্রয়োজনীয়তা মানুষকে উপায় খুঁজতে বাধ্য করে। ওসব উদ্যোগে এখন কেউ ফিরেও তাকাবে না।'

আরও একটি সহজ উদাহরণ দিয়েছেন কোসাম্বি। পাঁচশো বছর আগে আমাদের দেশে খুব কাছের জিনিস ও খুব দূরের জিনিস না দেখতে পাওয়াকে এক ধরনের অন্ধত্ব বলে বিবেচনা করা হত। এখন তা হয় না। চশমা উদ্ভাবিত হয়েছে। চাইলেই চশমা লাগিয়ে কাজের ও দূরের জিনিস দেখা যায়। প্রয়োজনে চিকিৎসাও করা যায়।

এখন আর এই অসুবিধাকে কেউ অন্ধত্ব বলে না। আসল কথা হল, চশমা চোখে পড়বার জন্য টাকা চাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল মানুষের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। পরীক্ষার সঙ্গে কারিগরি বিদ্যা চর্চার প্রশ্নটিও জড়িত। বিজ্ঞান ড়তে গেলে ধারাবাহিক পাঠক্রম চর্চা অপরিহার্য। চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যের বেলায় আমরা যে কোন যুগের কাজকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে আলোচনা করতে পারি। নন্দনতত্ত্বের একটা পূর্বরেশ বরাবরই থেকে যায়। সব কাজের বেলায় হয়তো একথা সত্যি নয়। বিজ্ঞানের বেলায় সময় ও কালনিরপেক্ষ প্রশংসা চাইলেই যে করা যায়, এমনটা নয়।

দুজন শিল্পী একই দৃশ্যের ছবি আঁকছেন। আলাদা হবেই। দুজন চিত্রগ্রাহক একই বস্তুর ছবি তুলছেন। আলাদা হবেই।

অনেকটা বড় জায়গা জুড়ে কোসাম্বি সামাজিক কুসংস্কার ও বৈজ্ঞানিক রীতিনীতির সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সামাজিক পরিকাঠামোয় সেই আলোচনাকে তিনি বিস্তৃততর করেছেন। বিজ্ঞানে পরীক্ষার গুরুত্বই প্রধান। প্রবাদ প্রবচন ও কুসংস্কারে তার কোন বালাই নেই।

স্পষ্ট বলেছেন কোসাম্বি। বিজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজবিকাশের ধারার অন্যতম ফসল। বলেছেন এমন কথাও, আথচ এই অমোঘ সত্য আমরা অনেকেই বুঝতে চাই না। এখানে আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, জে. ডি. বার্নাল, জে বি এস হলডেন, যোসেফ নীডহ্যাম ও কোসাম্বিকে বিজ্ঞান ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যাকার হিসেবে সমপংক্তিভুক্ত করতে পারি। এই দার্শনিক ভিত্তিভূমি নিশ্চিতভাবেই মার্কসীয় তত্ত্ব থেকে জন্মলাভ করেছে। এঙ্গেল্‌স্‌-এর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখির দিকেও এই প্রসঙ্গে আমাদের নজর রাখতে হয়।

আধুনিক পৃথিবীতে নানা দেশে বিজ্ঞান ও উৎপাদন সম্পর্ক কীভাবে পরিচালিত হয়েছে লেখক তা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষমতা অকল্পনীয়। এককালে বিজ্ঞানীরা নিজেদের উদ্ভাবনা গোপনে রেখে দিতে চাইতেন। নিউটন পর্যন্ত এমনটা করেছিলেন। ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতির বদল ঘটে। বিজ্ঞানের সত্য জনসাধারণের সামনে উন্মোচন করতে হয়। বিশেষজ্ঞদের মতামতের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

ইংল্যান্ডে দুই বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা নিউটনকে পেয়েছি। ফরাসি

বিপ্লবে যখন সমাজের স্থবির জঞ্জাল অপসারিত হচ্ছে, ল্যাগরাঞ্জে, লাপ্লাস, অ্যাম্পিয়ার ও বার্থেলো জন্মগ্রহণ করেছেন। জার্মানি যখন ইখরোপে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াল, বিজ্ঞানী গাউস এলেন। সব ঘটনাকেই যদি 'কাকতালীয়' মনে করি, আমরা বিজ্ঞানকে সমাজ বিকাশের ফসল হিসেবে অভিহিত করতে সমর্থ হব না। বিজ্ঞান শুধুমাত্র কয়েকজন প্রতিভাবানের অবদান—এমনটা ভাবলে অংশত অলৌকিকতাকেই প্রশ্রয় দিতে হয়।

নিউন প্রিজম নিয়ে আলোক বিজ্ঞানের যে পরীক্ষা সম্পাদন করেছিলেন, এখন কলেজের বিজ্ঞানের সাধারণ ছাত্র-ও তা করতে পারে। এই ছাত্র কি নিউটনের মত কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারে? পারে না। কেন পারে না?

'The weight, the significance of a scientific discovery depends solely upon its importance to society'.

স্বভাবতই নিউটন পৃথিবীর 'সেরা মনীষী'। কলেজের বিজ্ঞান পড়ুয়া ছাত্রটিকে এই গন্ডির বাইরে রেখেই আলোচনা করতে হয়।

রচনাটি দীর্ঘ। এতে বিজ্ঞান ইতিহাসের আরও নানা প্রসঙ্গ এসেছে। ইউরোপে গির্জা, বুর্জোয়া সম্প্রদায়, সামন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে বিজ্ঞানীদের শত্রু মিত্র সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন কোসাম্বি। সত্যি বলতে কী, পৃথিবীর যে কোন দেশেই বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সমাজ সম্পর্কিত এমন উঁচুমানের মৌলিক চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ আমরা খুব বেশি খুঁজে পাব না।

নিবন্ধটি পড়তে গিয়ে আমাদের বারবার জে ডি বার্নালের লেখা ধ্রুপদী গ্রন্থ 'সায়েন্স ইন হিস্ট্রি'র কথা মনে পড়ে যায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ১৯৩৯ সালে লেখা বার্নালের বিখ্যাত বই 'সোশ্যাল ফাংশন অফ সায়েন্স'। এই বইয়ের সমালোচনা করেছিলেন ডি. ডি. কোসাম্বি। সমালোচনাটি দুর্লভ নয়। এই বইয়ে আমরা যোগ করব।

কোসাম্বি যখন মুম্বাইয়ে TIFR-এ চাকরি করছেন। বিজ্ঞানী ভাবা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাদের দেশে নিউক্লিয় শক্তি গবেষণার প্রধানতম কান্ডারি বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। যখন নেহরুর স্নেহধন্য ভাবা পরমাণু শক্তির প্রসারে মগ্ন, একই প্রতিষ্ঠানে থেকে কোসাম্বি সৌরশক্তির স্বপক্ষে নিজের অভিমত নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার করে গিয়েছেন। এখন শক্তি পরিসংখ্যান স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর

জে ডি বার্নাল

হয়েছে। আমাদের দেশে মাথাপিছু সূর্য থেকে ৫.৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তি নিঃসরিত হয়। সৌরকোষ তৈরি করে তাকে কাজে লাগাতে হবে। কার্বন ন্যানোটিউব কাজে লাগালে সৌরকোষের সক্রিয়তা বাড়বে—এমনটা বিজ্ঞানীদের অভিমত। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. কালামও এই আশা প্রকাশ করেছেন। মনে রাখবেন পাঠক, উন্নত দেশগুলো প্রধানত শীতপ্রধান দেশ। সূর্য 'বড়লোক' দেশের মাথার উপরে বেশিক্ষণ থাকা পছন্দ করে না। গরিব দেশের আকাশে বহুক্ষণ থাকে। তাই সৌরশক্তির গবেষণা বড় আকারে আমাদের-ই করতে হবে। সূর্যকিরণের মার্কিনি দখলদারি হবার সম্ভাবনা যেহেতু নেই, ভারত এই গবেষণায় অগ্রগামী হোক। কোসাম্বির জীবনবীক্ষা গ্রহণ না করলে ক্ষতি তো আমাদের-ই।

# ডি ডি কোসাম্বি ও ড্যানিয়েল ইনগল্‌স্‌

'...he was indeed a truly great man'.

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ এ. এল. ব্যাশম উপরের লাইনটি লিখেছিলেন। ২০০৭ ডি. ডি. কোসাম্বির জন্মশতবর্ষ। এই বহুমুখী প্রতিভার মানুষটি এখন দেশে ও বিদেশে নানাভাবে আলোচিত হবেন, এই আমাদের প্রত্যাশা। কে না পারেন তাঁকে নিয়ে আলোচনা করতে? মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীরা পারেন। ইতিহাসের ছাত্ররা পারেন। বিজ্ঞানীরা পারেন। পৃথিবীর শান্তি আন্দোলনের কর্মীবন্ধুরাও পারেন। বুঝতেই পারছেন পাঠক, অতগুলো বিষয়ে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

সত্যিই কি তাই? ১৯৪৯-৫০ সালে ব্যাশমের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। পরিচয় হয়। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সেই বন্ধুত্ব গভীরতায় পৌঁছায়। ব্যাশম লিখেছেন, 'একদিন 'বাবা' (কোসাম্বির ডাকনাম) আমাকে জন বুনিয়ানের 'পিলগ্রিম'স প্রগ্রেস' থেকে বেশ কয়েকটি পংক্তি মুখস্থ বলে গেলেন। আমি অবাক। সপ্তদশ শতাব্দীর এই ধ্রুপদী পংক্তি তাঁর মুখস্থ থাকে কেমন করে?'

কোসাম্বি নিজে থেকেই উত্তর দিয়েছিলেন। 'আমার মতো ঘোর নাস্তিকের মুখে অবিশ্বাস্যই মনে হয়। তবে আমি বুনিয়ানের ভাষাটা পছন্দ করি। এমন সুন্দর, সহজ। তিনি তার সময়ের লোকপ্রিয় সংস্কৃতির ফসল। ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও তাঁর নীতিশিক্ষাগুলো সকলেরই ভালো লাগে।'

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সত্যিকারের পণ্ডিত ছিলেন ডি. ডি. কোসাম্বি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ ড্যানিয়েল এইচ. এইচ. ইনগল্‌স্‌ ছিলেন তাঁর নিকট বন্ধু। পুরোনাম ড্যানিয়েল হেনরি হোম্‌স্‌ ইনগল্‌স্‌। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব বিভাগে ওয়েল্‌স্‌ অধ্যাপক ছিলেন। নিউইয়র্ক শহরে তাঁর জন্ম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্ত ডিগ্রি লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার

পর সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপনায় যোগদান করেন। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্থায়ীপদে ছিলেন। বিভাগীয় পদ ছেড়ে দিলেও ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ওই বিভাগে পড়িয়েছেন।

বিদ্যাকর নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাংলাদেশে সতেরোশো সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ করে একটি সংকলন তৈরি করেছিলেন। অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইনগল্‌স্‌ সেই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই বইয়ের ভূমিকা পড়লে তাঁর পাণ্ডিত্য সহজেই অনুমান করা যায়। বইয়ের শিরোনাম ছিল 'অ্যান অ্যান্থোলজি অফ সংস্কৃত কোর্ট পয়েট্রি'।

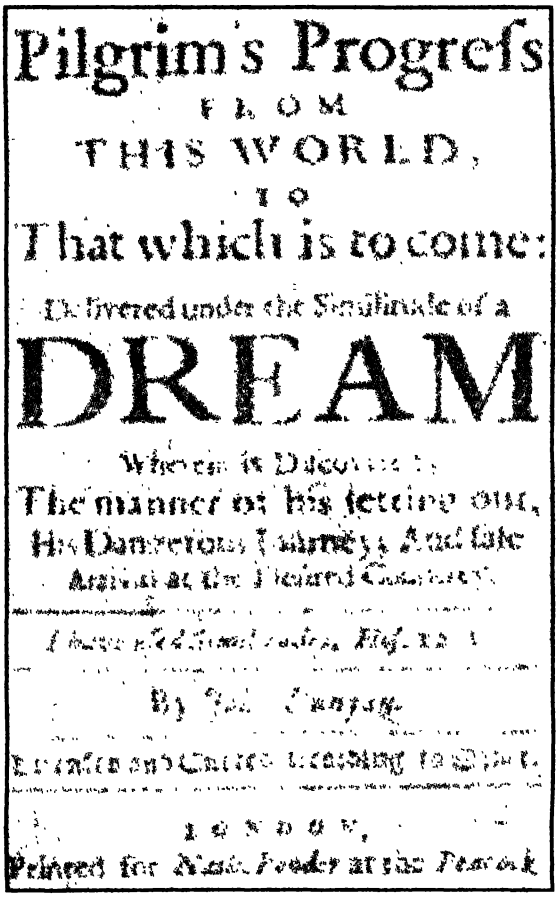


Pilgrim's Progress
FROM
THIS WORLD,
TO
That which is to come:
DREAM
LONDON,

পিলগ্রিম'স বইয়ের প্রচ্ছদচিত্র

১৯৯৯ সালের ১৭ই জুলাই তিরাশি বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

আগেই বলেছি, কোসাম্বি ও ইনগল্‌স্‌ খুব ভাল বন্ধু ছিলেন। এই দুই বন্ধুর বিদ্যাচর্চার উপাখ্যান আমরা এখানে আলোচনা করব।

কোসাম্বির লেখা একটি বইয়ের নাম 'দি এপিগ্রামস টু ভরতহরি'। ১৯৪১ সালে কোসাম্বি যখন ফার্গুসন কলেজে পড়াচ্ছেন তখন তিনি কলেজের ম্যাগাজিনে 'ভরতহরির কাব্যে বিচ্ছিন্নতার মাত্রা' শিরোনামে একটি রচনা লেখেন। ভরতহরিকে নিয়ে এর আগেও অনেকে লিখেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণভঙ্গির চেয়ে কোসাম্বির বিশ্লেষণ ছিল পুরোপুরি আলাদা। মৌলিক চিন্তায় তা সমৃদ্ধ। লেখাটি বেশ বড় ছিল। যুক্তিতর্কের সহায়তা নিয়ে

কোসাম্বি বলতে চেয়েছেন, কবীর, তুকারাম বা তুলসীদাসের মতো ভরতহরি জনতার কবি ছিলেন না। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি। সেই শ্রেণি বিদেশি শাসকদের সহায়তা করে।

'দি এপিগ্রামস...'বইয়ে ভরতহরিকে কোসাম্বি এমন ভাবেই চিত্রিত করেছেন। বইটির সমালোচনা করেছিলেন অধ্যাপক ইনগল্‌স্‌। ১৯৫১ সালের ৬ই জানুয়ারি মুম্বাই থেকে চিঠি লেখেন কোসাম্বি।

প্রিয় ডক্টর ইনগল্‌স্‌,

খুব সহানুভূতি দেখিয়ে এমনকি তোষামোদ করে ভরতহরি-র সমালোচনা লিখেছ বলে তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সমালোচনাটি গতকাল আমার হাতে এসেছে। যেখানে আমাদের মতের মিল হচ্ছে না সেখানে ঝগড়া করতে নামব না। তবে তোমায় একটা কথা বলি। কোনোদিন যদি সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত সাহিত্যকে বিচার কর, আমার মনে হয়, আমার মতের সঙ্গে তোমার মত মিলে যাবে।

অনেক পাঠক জানেন, কোসাম্বির বাবা ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি হার্ভার্ডে গবেষণা করতে একাধিকবার এসেছেন। হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজে তাঁর লেখা 'বিশুদ্ধিমাগ্গ' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। পিতাপুত্র দুজনকেই অধ্যাপক ইনগল্‌স্‌ জানতেন।

অধ্যাপক ইনগল্‌স্‌ ভারতবর্ষে আসবেন। এই নিয়ে কোসাম্বির সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময় চলছে। ইনগল্‌স্‌ 'ডক্টর' সম্বোধন করতেন বলে কোসাম্বির আপত্তি ছিল। কেন না, তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেননি। আর একটি চিঠি দেখুন পাঠক। চিঠির তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

প্রিয় ইনগল্‌স্‌,

ডক্টরেট ডিগ্রি নেই আমার। তুমি বরাবর আমায় 'ডক্টর' বলেই সম্বোধন করে যাচ্ছ। একটা কাজ করা যাক। আমরা দুজনের কেউই আর 'ডক্টর' সম্বোধন করব না। ১৯২৯-এর মে পর্যন্ত অপেক্ষা করিনি। ভয়াবহ মন্দায় ওখানে কর্মসংস্থানের কোনো আশা ছিল না। ঘটনা এই, আমার কোনো ফেলোশিপও ছিল না। পৃথিবীর হাজার বিষয়ে আমার আগ্রহ। আমার আচরণ অমার্জিত। ব্যবহার খারাপ। আরও অভিযোগ ছিল। তাই ফেলোশিপ পাইনি। এসব কথা শুধু তোমায় জানালাম। আর কাউকে বলো না।

যদি আমাদের এদেশে দেখা না হয়, খুবই দুঃখ পাব। জুন আমাদের ছুটির শেষ মাস। ১লা জুলাই কাজে ফিরে আসব। আমার রুটিন খুব সাধারণ। কাজের দিন হলে প্রতি সোমবার আমি পুনে থেকে আসি আর শুক্রবার সন্ধেবেলা পুনে ফিরে যাই। ছুটির সময় পুনেতে আমি চিন্তা করার সময় পাই। মুম্বাইয়ে কাজের পাঁচটা দিন আমাকে বিজ্ঞান গবেষণায় সময় দিতে হয়।...

বেশিরভাগ ছুটিতেই আমি পুনে থাকি। বছরে দুবার ব্যাঙ্গালোরে মায়ের কাছে যাই। মা সেখানে শেষ জীবন কাটাচ্ছেন....

ডি. ডি. কোসাম্বির সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলতে গিয়ে ইনগল্‌স্‌ লিখেছেন, 'বিদ্যাকরের লেখা 'সুভাষিতরত্নকোষ' বইটি আমরা তাঁকে হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজে প্রকাশের জন্যে তৈরি করে দিতে বলেছিলাম। কোসাম্বি ও ভি. ভি. গোখেল রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিব্বত থেকে তুলে আনা একটি বইয়ের আলোকচিত্র পাঠান। একটি ফটোপ্লেটে অনেক পৃষ্ঠার ছবি। কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। কোসাম্বি খবর পেয়েছিলেন, কাঠমাণ্ডুর লাইব্রেরিতে বইটির একটি কপি রয়েছে। রোমে অধ্যাপক তুচ্চির কাছেও তিব্বতের বইয়ের আলোকচিত্র ছিল। কোসাম্বি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন।'

বইটি সম্পাদনা করেন ডি. ডি. কোসাম্বি। ভি. ভি. গোখেল সহ-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

একটা কথা আমরা এখনও বলিনি। অধ্যাপক ইনগল্‌স্‌ কলকাতাকে ভালোবাসতেন। কলকাতায় বেশ কয়েকবার এসে থেকেছেন। কোসাম্বির চিঠিতে ভারতে আসার যে কথা রয়েছে, আসলে ইনগল্‌স্‌ কলকাতায় এসেছিলেন। কোসাম্বির অনুরোধ রেখেছেন তিনি। অল্পদিন কলকাতায় থেকে বেশির ভাগটাই পুনেতে কাটিয়েছিলেন। ওই সময় কোসাম্বি চীনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চীনদেশের শান্তি কমিটির সঙ্গে কথা বলতে যাবেন। সেই সঙ্গে ভেবেছিলেন, তিব্বতের বই থেকে স্পষ্ট আলোকচিত্র তুলে আনবেন। ওসব কথা ১৯৫২ সালের ১৭ই মে তারিখে লেখা চিঠিতে কোসাম্বি ইনগল্‌স্‌কে জানিয়েছিলেন। চিঠি থেকে তাঁর সামাজিক চেতনার এক স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রিয় ইনগল্‌স্‌,

তোমার বারো তারিখে চিঠি সবে পেয়েছি...আমি আগে তোমায় বলেছিলাম, চীন থেকে সরাসরি কিছু পাব বলে আশা করছি। দুর্ভাগ্যক্রমে গতবছর সেদেশে আমন্ত্রিত হয়েও যাওয়ার অনুমতি পাইনি। এবার আবার চেষ্টা করব। এক সপ্তাহের আগে সেদেশের বিমানে চড়ব না। চীন দেশের শান্তি কমিটির আমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রথম সচিব মারফত খবর পাঠিয়েছেন, আমার যাওয়ার অনুমতি পেতে কোনো অসুবিধে হবে না কিন্তু (আসল উত্তর সবসময় 'কিন্তু' দিয়েই শুরু হয়) তিনজনের প্রতিনিধিদলের বাকিদের যেতে অনুমতি দেওয়া হবে না। এই সঙ্গে বলতে ভুল করেননি, আমি না গেলে প্রধানমন্ত্রী খুশি হবেন। আমি সকলের কথা বিবেচনা করতে প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি। যদি তিনি রাজি না হন, প্রতিবাদ জানিয়ে আমি না-ও যেতে পারি। একা যাওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি বাতিল করছি না। কিন্তু তোমায় সত্যি কথাটা বলছি, ঘুরতে আমার ভাল লাগে না। শুধু পাণ্ডুলিপির জন্যে যেতে চাই না। শান্তি আন্দোলনে আন্দোলনটাই বড় কথা। শত্রুরা আমাদের বিষয়ে যতই নিন্দেমন্দ করুক, আমরা যতটা পারি সাধ্যমতো কাজ করি। তুমি অসুবিধেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। যাকে বারবার যেতে বাধা দেওয়া হয় তার পক্ষে দূর তিব্বতে গিয়ে পাণ্ডুলিপি জোগাড় করে আনা সহজ কাজ নয়। যাই হোক, চিঠি দিয়ে আমি চেষ্টা করব। আগের চিঠিটা পাওনি, এই চিঠিও হারিয়ে যাবে কিনা কে জানে।

পুনে আসতে চেয়েছ। আমার মনে হয়, আগের চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তুমি জান, তোমরা এখানে এলে তোমার দেশের দূতাবাস সারাক্ষণ গোয়েন্দাগিরি করে। আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে জানতে পারলে বিপদ আরও বেশি। (মার্কিন দূতাবাস আমার প্রতি কখনও সামান্যতম মনোযোগও দেয়নি)...তুমি এক্ষুনি লেখ...ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কাজ করার পুরো অনুমতি চাও। বোরি গেস্ট হাউসে একটি সুইট চেয়ে দরখাস্ত কর। আমি কাছাকাছি থাকি, সবসময় তোমায় সাহায্য করতে পারব।

খুব লম্বা চিঠি। এই চিঠিতে কোসাম্বি কিছু লোকজনের কথা লিখেছেন যাদের পাণ্ডিত্য বলতে কিছু নেই, চরিত্রগুণ বলতে কিছু নেই, অথচ এরা নিজেরাই পণ্ডিত বলে ঢাক-ঢোল পেটান। আবার অনেকের কথা বলেছেন যারা প্রকৃতই পণ্ডিত।

শান্তি আন্দোলনের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'এত বেশি জড়িয়ে পড়েছি, মনে হয় কোনোদিন চাকুরি চলে যাবে। এসব ভাল। গবেষণার কাজে আরও বেশি সময় দিতে পারব।'

ইনগল্‌স্‌ তখন কলাকাতায় চিঠি দিলেন। চীনদেশ তখনও তাঁর সকল ভাবনায় জড়িয়ে রয়েছে। বন্ধু ইনগল্‌স্‌কে লিখলেন,

'বহু বিষয়ে চীন আমার কাছে এক বিস্ময়। শান্তি আন্দোলনে দুই শ্রেণির প্রতিনিধি ছিল। পর্যটক আর কর্মী শ্রেণি। আমি দ্বিতীয় দলে ছিলাম। বাইরে ঘুরতে যাওয়ার সময় পাইনি। এমনকি যথেষ্ট ঘুমোতেও পারিনি। কিন্তু চিং কে-মু ও শ্চি হায়ান-জিনের ('মহাবাস্তু' বিশেষজ্ঞ) সঙ্গে দেখা করেছি। আরও কয়েকজন পণ্ডিত মানুষের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রথম দুজন সংস্কৃতজ্ঞ। বাকিরা সকলেই পাণ্ডিত্যের জন্য নজর কাড়েন। আমরা যারা ইউরোপ, আমেরিকা বা ভারতে পড়াশুনো করেছি, ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল বিস্ময়কর মনে হবে। সংস্কৃত পড়ার ছাত্র খুব বেশি নেই। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রতি আগ্রহ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ছে। হিন্দি ক্লাস তো খুবই জনপ্রিয়।

চীন সম্পর্কে সবার প্রথমে যে কথাটা বলতে হয়, স্বাধীনতার পরে এই দেশের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। রাত্তিরে কেউ বাড়ির দরজায় তালা দেয় না। কিছু চুরি হয় না। কুলির কাজ করছে যারা, হেসে হেসে পুলিশের সঙ্গে গল্প করছে। চাষের উপায় বদলায়নি তবু একটুকরো জমিতে আগের চেয়ে শতকরা কুড়িভাগ বেসি ফসল জন্মায়। অর্ধেক সময়ে বাড়িঘর তৈরি হয়ে যায়। নিকাশী ব্যবস্থা ওই দেশে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। সব বিষয়ে সে ভারতের চেয়ে এগিয়ে। হঙ-কঙে যাও। সেখানে পুরোনো চীন দেখতে পাবে।'

উপরের মতো কথাবার্তা কিছু নেই। একেবারে সাধারণ চিঠি। কোথাও কোথাও মজার আভাস। এমন চিঠিও লিখেছেন কোসাম্বি।

১৯৫২ সালের ২১শে জুলাই মুম্বাই থেকে কোসাম্বি লিখলেন—

প্রিয় ইনগল্‌স্‌,

তুমি এখন ভারতে। ভেবেছিলাম, মুম্বাই হয়ে পুনে আসবে। তা নয়। তুমি মাদ্রাজ হয়ে আসছ। বেরি নিজাম গেস্ট হাউস থেকে আমার বাড়ি এক ফার্লং দূরেও

নয়। তোমার জরুরি কোনো কিছু দরকার হলে আমার স্ত্রী তোমায় দেবেন। হয়তো সে জিনিস গেস্ট হাউসে নেই, বাড়িতে রয়েছে। বৃহস্পতিবার, চব্বিশ তারিখ রাতে আমি ফিরতে পারব আশা করছি। তার আগে যদি আমার বাড়িতে যাও, কুকুর হইতে সাবধান! প্রতিবেশীরা এই কুকুরের মালিক। থাকে আমাদের সঙ্গে। তবে কান ফাটানো চিৎকার, দুর্ভাগ্যবশত, তার কামড়ের চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক নয়...

চারমাস এদেশে থেকেছেন ইনগল্‌স্‌। প্রতি সপ্তাহের শেষে কোসাম্বি মুম্বাই থেকে পুনে ফিরেছেন। তখন দুজনের দেখা হয়েছে। দুজন নয়। তিনজন। গোখেলও নিয়মিত আসতেন। কথা হত কাজ নিয়ে। টীকা যোগ করার কাজটুকু ইনগল্‌স্‌-ই করতেন। বাকি দুজন সম্পাদনার কাজ করতেন। টীকা লেখা শেষ হতে অনেকদিন লাগল। গল্পই তো হত বেশি। নৈশ ভোজনের আসরে পুনের পাহাড় আর প্রকৃতি প্রাধান্য পেত।

ইনগল্‌স্‌ লিখেছেন, 'অতি সাধারণ বিষয়ে আমাদের মতের মিল হত না তবু তাঁর সান্নিধ্যের অপেক্ষায় বসে থাকতে ভাল লাগত। কোসাম্বি ছিলে মার্কসবাদী। আমি কোনো তন্ত্র-পন্থী ছিলাম না, সংরক্ষণপন্থী বলা যেতে পারে।'

দুজনের নানা বিষয়ে জোর তর্ক হত। কোসাম্বি বলতেন, যে শিল্প সমাজউন্নয়নের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে না, তার প্রয়োজন নেই। ইনগল্‌স্‌ বলতেন, শিল্প হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে একটা সৃষ্টিকে রাজনৈতিক বশ্যতা বর্জন করতে হবে। আশ্চর্যের এই, বইয়ের পছন্দ তালিকা দুজনের প্রায় একই রকম। তবে একই কারণে দুজনের ভালোলাগা গড়ে উঠেনি। ইনগল্‌স্‌ বন্ধু কোসাম্বির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভিন্ন কারণে ভালো লাগার উদাহরণ দিয়েছেন। বিখ্যাত কবি ব্ল্যাক 'মিলটন' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি দুই বন্ধুরই প্রিয়। ইনগল্‌স্‌ তাঁর নিজের দুটি প্রিয় লাইন পেশ করেছেন—

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!

কবিতার ইমেজ ইনগল্‌স্‌কে মুগ্ধ করেছে। কোসাম্বির ভাল লাগার লাইনগুলি ভিন্ন।

Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem

In Englad's green and pleasant land.

বিপ্লবী দর্শনের ভাবনা উপরের লাইন ক'টিকে জারিত করেছে। সেই ভাবনায় যে উদ্দীপিত হবেন কোসাম্বি, এই নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

যাই হোক, আমেরিকায় ফিরে গেলেন ইনগল্‌স্‌। এরপর একটানা দু'বছর প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতেন ওঁরা। বইয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে বেশির ভাগ কথা থাকত। কখনও কখনও কলম দুজনের ভিন্ন পথেও গিয়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকাপাকি চাকুরি পেয়ে ইনগল্‌স্‌ কোসাম্বিকে চিঠি লিখেছেন। দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমার একটা গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন পেল না'।

এমন চিঠি পেয়ে কোসাম্বি জবাব দিতে দেরি করেননি। ১৯৫৩ সালের ২৩শে মে মুম্বাই থেকে লিখেছিলেন—

প্রিয় ইনগল্‌স্‌

তোমার ষোলো তারিখের লেখা চিঠি গত রাতে পেয়েছি। তোমার পাকা চাকুরির খবর পেয়ে, তা-ও আবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তোমার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। তুমি সম্মানের সঙ্গেই কাজ করবে।

তারপর কোসাম্বি যা লিখেছিলেন, মানুষটাকে চিনতে আমাদের কোনো সময় দিতে হয় না। প্রকল্প অনুমোদিত হয়নি বলে ইনগল্‌স্‌ দুঃখ করে লিখেছিলেন। জবাবে কোসাম্বি জানালেন,

....আমাদের উর্বর কিন্তু খামখেয়ালি 'কামধেনু', আমাদের সরকার, অনেক বেশি পরিমাণ চাইলে দিতে পরোয়া করে না। নগদ অর্থের বন্যা বইয়ে দেয়। একজন মানুষ হয়তো খুব দরকারে মাত্র পাঁচশ টাকা চাইল। সে পাচ্ছে না। একজন দশহাজার টাকা চাইল। জোরদার সুপারিশ তার পক্ষে। টাকা পেতে অসুবিধে হল না। এক লক্ষ টাকা পাওয়া তো রুটিন বিষয়। যদি দশ লক্ষ চাও, শুধু যে সবকিছু পাবে তাই নয়। 'জনগণের উপকারী বন্ধু' হিসেবে তোমার নাম ঘোষিত হবে। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। টাকা যেন সবটাই তোমার জলাঞ্জলি যায়।

উপহাসের সুরে এমন নির্মম সত্য ডি. ডি. কোসাম্বির মতো মানুষই উচ্চারণ করতে পারেন। চিঠিটার শেষ লাইন দুটো তাঁর দায়বদ্ধতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা

বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকা থেকে একজন ঐতিহাসিক ভারতে এসেছেন। তিনি বলছেন, তিনি ঐতিহাসিক। সত্যিই কি তিনি ঐতিহাসিক? কোসাম্বি বললেন, 'তিন ঘণ্টা ধরে তাঁকে প্রশ্ন করেছি। ভারতের কোনো যুগের ইতিহাস নিয়েই তাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি। এই ভেকধারী ঐতিহাসিকদের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরতে তোমাদের দেশে প্রচার প্রয়োজন। আমাদের দেশের যে ছেলেরা আমেরিকায় গিয়ে পড়তে চায়, তাদের নিরাময়ের জন্য পাগলা গারদ প্রয়োজন।' আজ এমন কথা বলতে গেলে শারীরিক নিগ্রহ জুটলেও আশ্চর্য হব না।

বিদ্যাকরের সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে যে বই প্রকাশিত হবে তার ভূমিকা লিখছেন কোসাম্বি। হার্ভার্ডে একটু একটু করে লিখে পাঠিয়েছেন। ইনগল্‌স্ বলেছেন, প্রথম পঞ্চাশ ভাগ অসাধারণ। পরের পঞ্চাশভাগ নিয়ে দুজনের মধ্যে জোর বিতর্ক বেধে যায়। মিকি স্পিলেনের গোয়েন্দাগল্প কোসাম্বির বইয়ের ভূমিকায় যোগ হয়। কোসাম্বি স্পষ্ট করে বলেন, এই লেখার সমাদর থেকে আমেরিকার সামাজিক অধঃপতনের ছবি বুঝতে পারা যায়। পাদটীকায় কোসাম্বি লিখেছিলেন, 'আমাকে একজন বলেছিলেন, একসময় ওঁর লেখা বই মিলিটারিদের পড়া বাধ্যতামূলক চিল্ল। পরমাণু যুগের বীরত্বপ্রচার করতে হবে। গণহত্যা সংগঠিত করে মানুষের মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে।'

ইনগল্‌স্ তাঁর লেখা দীর্ঘ চিঠিতে এমন অভিমত খণ্ডন করেছেন। চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ আমরা এখানে তুলে ধরছি।

'আমি তিনবছর সেনাদলে কাজ করেছি। আমেরিকার মিলিটারিদের বাধ্যতামূলক পড়াশুনো বলে কোনো কিছু শুনিনি। সত্যি বলতে কি, আমাদের অধিকাংশ সেনাই পড়তে শেখেনি। যদি বা তা-ও হয়, কারও রচনাকে এমন অপপ্রচারের অধীনে নিয়ে আসা সঙ্গত হচ্ছে না। মিকি স্পিলেনের কথা যেভাবে লিখেছ, যথাযথ মনে হয়নি। খেঁকশিয়ালের শিকারে হিংস্রতার কথা বলতে জৈনধর্মের যেমন পুস্তিকা বেরোয়, তোমার অভিমত আমার কাছে তেমনটাই মনে হয়।

....আমি নিশ্চিত, আমার সহকর্মীদের যদি তোমার লেখা ভূমিকার কথা জিজ্ঞেস করি, এঁরা অনেকেই বলবেন 'কমিউনিস্ট ব্যাখ্যা তো ছাপছোই, কিন্তু এর শেষ কোথায়? পৃথিবীর কোথাও কমিউনিজম ও সত্যতা সমার্থক। আবার কোথাও

কমিউনিজম মিথ্যার নামান্তর। আমি দ্বিতীয় পৃথিবীর নাগরিক। স্রোতের বিরুদ্ধে আমাকে সাঁতার কাটতে হচ্ছে। আমি তা করতে রাজি আছি।'

চিঠির উত্তর দিতে দেরি করেননি কোসাম্বি। লিখলেন, 'তোমার একুশ তারিখের বিস্ফোরণ গতকাল রাতে বাড়িতে এসে পেয়েছি।' ইনগল্‌স্‌-এর প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছেন কোসাম্বি। সবশেষে লিখেছেন, '...এভাবে হয়তো আমরা লিখতে পারি। এই পৃথিবীর তিনটি ভাগ রয়েছে। (১) মার্কসবাদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; (২) মার্কসবাদের দিকে অগ্রসরমান ও (৩) উদাসীন পৃথিবী। পৃথিবীর তিন নম্বর অংশে সংকট দেখা দিলে কখনও প্রথমভাগ কখনও দ্বিতীয় ভাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমি প্রথম পৃথিবীর নাগরিক। তুমি ও তোমার সহকর্মীরা দ্বিতীয় পৃথিবীর নাগরিক। এমন পরিস্থিতিতে ভূমিকার যে পাণ্ডুলিপিটি আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, তার চেয়ে ভিন্ন কি হতে পারত?

অপপ্রচারে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এর জন্যে আমার চেয়ে ভাল মাধ্যম রয়েছে। প্রশ্ন এই নয় যে মার্কসবাদ সমর্থন করছি না বিরোধিতা করছি। যে সকল নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তা খুবই সামান্য। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দর্শনের ভিত্তিতে আলোচনা না করলে ওই সামান্য প্রমাণের উপকরণ নিয়ে এগোনো যায় না।'

এমন চাপান উতোরের মধ্য দিয়ে কাজ এগোয়। দেড় বছর সময় ধরে ভূমিকা লেখার কাজ শেষ হয়।

১৯৫৫ সাল। কোসাম্বি আর্থরাইটিস অসুখে ভুগছিলেন। এর চিকিৎসা নেই কোনো। কখনও বাড়ে। কখনও কমে। ওই বছর অসহ্য কষ্ট পেলেন তিনি। ওই বছরেই তিনি তাঁর মাকে হারান। ছোটো বোন বড় রকমের অসুখে পড়েন। কাজ তাঁর থেমে নেই। গ্রীষ্মের ছুটিতে কোসাম্বি ফিনল্যান্ড ও রাশিয়া সফর করেন। দুমাস দেশের বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, ইনগল্‌স্‌-এর লেখা একগুচ্ছ চিঠি পড়ে রয়েছে। উত্তর লিখলেন কোসাম্বি। উত্তরের তারিখ ১৩ই আগস্ট ১৯৫৫।

প্রিয় ইনগল্‌স্‌,

হেলসিঙ্কি ও মস্কো থেকে আজ সকালে আমি ফিরেছি। তুমি জানতে, গতবছর সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এবছর হেলসিঙ্কি থেকে আমন্ত্রণ পাই। 'পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ে ওদের সম্মেলনে

যোগ দিই। ওরা সবে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরি করতে শুরু করেছে। পাঁচ হাজার কিলোওয়াটের একটি স্টেশন চলছে। একবছর ধরে সেই বিদ্যুৎ বাড়িঘরে যাচ্ছে। কলকারখানায় যাচ্ছে। সম্মেলনের পর আমি ভারততত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেছি। নিজের চিকিৎসা করেছি। অনেকদিন আগেই ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। চিকিৎসার শেষে অনেকটাই ভাল হয়ে উঠেছি। যদিও এখনও পুরোপুরি ভাল হইনি।

শুনতে খুবই আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। বড় বড় বিষয় সোভিয়েত দেশ যতটা সংগঠিতভাবে সমাধা করেছে, ছোটো-খাট বিষয়ে তেমন নজর দেয়নি। লোকজনের সব গয়ংগচ্ছ ভাব, ঘুমোতে পারলে ভাল হয়, অনেকটা আমাদের ভারতীয়দের মতোই। তবে লোকেরা ভাল। যুদ্ধ প্রতিটি পরিবারে ধাক্কা মেরে গিয়েছে। সেসব পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। সরকারের সঙ্গেও কথা বলেছি। শান্তি প্রতিষ্ঠায় এদের সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে। এসব করতে গিয়ে, আমার নিজের কাজ কিছুই হয়নি। যে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলব, ওঁরা সব ছুটিতে গিয়েছেন। গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। অনেক প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ আমার বক্তৃতার কথা জানতে পেরে ছুটি না কাটিয়ে চলে এসেছেন। একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি সবশেষ বক্তৃতা দিয়েছি। তাঁদের তথাকথিত মার্কসবাদী পণ্ডিতদের নিয়ে বলেছি। তাঁরা অস্বস্তি বোধ করেছেন। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি বললেও আমি খুব ওঁদের বোঝাতে পারিনি। একজন সবকথা শুনে গিয়ে আবার বন্ধুদের বলেছেন, কোসাম্বির মার্কসবাদ চর্চা চামড়ার ভেতর পর্যন্ত প্রসারিত।...কী আর বলব। উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, আমার চামড়া বেশ ভারী। পুরোটাই চামড়া কিনা কে জানে!

যাই হোক, পুরনো রীতিতে যাঁরা সংস্কৃত চর্চা করতেন তাঁদের সকলেই মৃত। ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এঁদের যে ক'জন আছেন, সকলেই লেলিনগ্রাদে রয়েছেন। আমার সেখানে যাওয়ার সময় ছিল না। ইচ্ছেও ছিল না। শুধু কালিয়ানভ আছেন। আর সকলেই কমবয়সী। মেধার বিচারে কমজোরি বলেই তো মনে হল। তবে এঁরা সকলেই ভারততত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন। যদি ওঁরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান, আমি নিশ্চিত, গবেষণায় নতুন স্রোত বইবে। এখন ওঁরা জানেন না, কোথায় কোন দেশে কী কাজ হচ্ছে। আমার গবেষণাপত্রের রিপ্রিন্ট যাঁরা এই বিষয়ে কাজ করেন তাঁদের কাছে আসেনি। লাইব্রেরিতেও আসেনি। জীবরসায়নের

গবেষকেরা ভারত থেকে কিছু রিপ্রিন্ট ও ভরতহরির সংস্করণ নিয়ে গিয়েছিলেন। ওসব এখনও ওঁদের কাছেই রয়েছে। ভাল লাইব্রেরি পাইনি (হার্ভার্ড কলেজ লাইব্রেরির তুলনা করছি না)। শান্তি আন্দোলন ছাড়তে পারব না। মনে হচ্ছিল, আর সব ছেড়ে এখানে কিছুদিন থাকলে পরিবেশটা বদলে দিতে পারতাম।

... তোমার শোকবার্তা পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। মা যখন মারা যান, আমি কাছে ছিলাম না। এই দুঃখ ভুলতে পারব না। কোনো রকমে শরীরটাকে নিয়ে ঘুরেছি। ঘুরতে গেলে ভয়ানক চাপ পড়ে। তাই হয়েছে।'

এই চিঠিটার বিষয়ে দুটো কথা বলব। যে মানুষ দুমাস পর ফিরেছেন, তিনি এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেননি। সেদিন-ই ইনগল্‌স্‌-এর কাছে চিঠি লিখতে বসেছেন। চিঠির তলায় 'ডি. ডি. কোসাম্বি' সই করেননি। ডাকনাম 'বাবা' লিখেছেন। সম্বোধনের এই পালাবদল খেয়াল করলে আমরা দুজনের সম্পর্ক কেমন বদল হয়, তা নজর রাখতে পারি।

ইনগল্‌স্‌ সব বিষয়ে কোসাম্বির সঙ্গে একমত হতেন না। সমাজবিজ্ঞানে এই বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক। ইনগল্‌স্‌ বলেছেন, 'তাঁর চেয়ে বড় সমালোচক আমার আর কেউ ছিল না।' সকল চিঠি এখানে উল্লেখ করার প্রশ্ন উঠে না। ১৯৫৬ সালের একগুচ্ছ চিঠিতে কোসাম্বি ইনগল্‌স্‌-এর টীকার ত্রুটি আলোচনা করেছেন। ইনগল্‌স্‌ কোসাম্বির ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। চমৎকার লিখেছিলেন ইনগল্‌স্‌। একজন অভিনেতা যদি বোস্টন শহরে প্রশংসিত হন, যে কোনো জায়গায় তিনি প্রশংসিত হবেন। 'বাবা' যে প্রশংসা করতেন, তা ওই পর্যায়েই পড়ে। কোসাম্বি বন্ধুর রহস্যবাদের প্রতি দুর্বলতাকে আক্রমণ করেছেন। ইনগল্‌স্‌ তাঁর ভারতীয় পণ্ডিতবন্ধুর মার্কসবাদের প্রতি গভীর প্রত্যয়কে মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ঘোর বিতর্ক হয়েছে। ব্যক্তি বিতৃষ্ণা জন্মায়নি। আজ এই সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে পারছি কই? ব্যক্তি জীবনে সম্পর্ক রক্ষা করলে রাজনৈতিক দর্শনের আত্মসমর্পণের বাধ্যবাধকতা চলে এলে তখন সম্পর্ক ছেদ করাই যায়।

কোসাম্বির সৃষ্টি সংগ্রহের সম্পূর্ণ তালিকা এখন আমাদের হাতে রয়েছে। গণিতের প্রচুর মৌলিক গবেষণাপত্র রচনা করেছেন তিনি। ইতিহাস চর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। একাধিক উল্লেখযোগ্য বইয়ের সমালোচনা করেছেন।

'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া'র সমালোচনা পড়ে জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রতি খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। অথচ ঘটনা এই, ব্যক্তি আক্রমণ কোসাম্বি করেননি। নেহরুর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান ঐতিহাসিক জে. ডি. বার্নালের ধ্রুপদী গ্রন্থ 'সোশ্যাল ফাংশন অফ সায়েন্স' বইটিরও তিনি সমালোচনা করেছিলেন। অসামান্য সুন্দর ভঙ্গিতে তিনি বইটির সমালোচনা শুরু করেছিলেন। '...বইয়ের জ্যাকেটে লেখক দুটো লাইন লিখে সমালোচকের পরিশ্রম প্রায় পুরোটাই লাঘব করে দিয়েছেন। বিজ্ঞান কী করে? বিজ্ঞান কী করতে পারে?' ১৯৩৯ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯/৪০ সালে কোসাম্বি বইটির সমালোচনা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' কাগজে লিখেছিলেন। আমরা এই সমালোচনা বাংলা তর্জমা করে যোগ করেছি।

# চেনা মানুষের চোখে ডি ডি কোসাম্বি

*আর. পি. নানে। তিনি কোসাম্বির দীর্ঘকালের সহকারী ও বন্ধু। কোসাম্বি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে গিয়েছিলেন অরবিন্দ গুপ্তা। শ্রীগুপ্তা আমাদের দেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ছোটোদের জন্যে তিনি প্রচুর বিজ্ঞানের খেলনা তৈরি করেছেন। প্রচুর মজাদার বই লিখে ছোটেদের মত করে বিজ্ঞানের নানা কাহিনি বলে চলেছেন। ১৯৮৫ সালের ১৪ই জুন শ্রীগুপ্তা আর. পি. নানের সঙ্গে প্রায় দীর্ঘ তিন ঘণ্টা কথা বলেন। সেই কথোপকথনের ভেতর দিয়ে কোসাম্বির জীবনের অনেকগুলো আকর্ষণীয় দিক ফুটে উঠেছে। আমরা সেই কথোপকথনের সূত্র ধরে কিছু প্রয়োজনীয় কথা পাঠকবন্ধুদের কাছে পেশ করব।*

*ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রণী চরিত্র অমৃতপাদে ডাঙ্গের একটি বই অধ্যাপক কোসাম্বি সমালোচনা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গ আমরা পরে আলোচনা করব। শ্রী নানে বইটি বেরোবার অল্পকিছুদিনের মধ্যেই পড়েছিলেন। বইটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু কোসাম্বির সমালোচনা পড়ার পরে তাঁর মধ্যে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়। ভারততত্ত্ব বিষয়ে শ্রী নানের পড়াশুনো বিশেষ ছিল না। তিনি তখন ওই সময়ের প্রবীণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠক কমরেড ডি. কে. বেদেকারের কাছে যান। ডি. কে. তাঁকে বলেছিলেন, 'কোসাম্বির সমালোচনা সঠিক। তবে তিনি একটু নরম হলে পারতেন।' কেমন ভাষায় সমালোচনা লিখেছিলেন অধ্যাপক কোসাম্বি, আমরা খানিকটা পরে তার পরিচয় পাব।*

ওইসময় পুনে শহরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বই পত্র বলতে গেলে একমাত্র পিপল্‌স্ পাবলিশিং হাউসে (PPH) পাওয়া যেত। এটি ভাল চলছিল না। তাই একসময় বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে। শ্রী নানে ১৯৫৪ সাল থেকে ওখানে কাজ করতেন। ১৯৬১ সালের এক ভয়াবহ বন্যায় দোকানটির ভীষণ ক্ষতি হল। পঞ্চাশ হাজার টাকার বই জলে নষ্ট হয়ে যায়।

কোসাম্বি বিষয়ে শ্রী নানের অভিজ্ঞতা কেমন শোনা যাক। তখন কোসাম্বি বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের অগ্রণী চরিত্র। আগে থেকে না জানিয়ে একদিন তিনি ও এক বামপন্থী ছাত্রনেতা কোসাম্বির বিষয়ে কথা বলবেন ওঁরা, এমনটাই ইচ্ছে।

কোসাম্বি দরজা খুলেই বললেন, 'আমি শান্তি আন্দোলন বুঝি। আমার কুকুর কিন্তু শান্তি আন্দোলন বোঝে না।'

পরে একদিন ওঁরা তাঁর কাছে গিয়ে প্রায় দেড়ঘণ্টা বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের নানা বিষয়ে কথা বলেছেন।

সবটা শুনে ছাত্রনেতাটি বলেছিলেন, 'এসব কথা ছাত্রদের কাছে নিয়ে যাব কেমন করে?'

কোসাম্বিকে যেন খানিকটা হতাশ মনে হল। ছাত্রনেতাকে ধমকে বললেন, 'তোমার পরীক্ষা সামনে এসে গেছে। ফিরে গিয়ে ভাল করে পড়াশুনো কর।'

কোসাম্বির অগাধ পান্ডিত্য নিয়ে কেউ কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। পিপল্‌স্ পাবলিশিং হাউস থেকে তিনি প্রচুর বই কিনতেন। ওই সময়কার নানা সাময়িকপত্র কিনতেন। মুক্ত মনের পাঠক ছিলেন। মার্কস এঙ্গেলস তো পড়তেন-ই। বাইরের লেখাও পড়তে বলতেন। PPH-এর বন্ধুদের মার্কসীয় সাহিত্যের বইরেও কিছু বইপত্র আনতে বলেছিলেন। শুধু সোভিয়েত বই পড়া তাঁর মনঃপূত ছিল না।

একদিন কথায় কথায় শ্রী নানে বললেন, 'আপনার কিছু লেখাপত্র দিয়ে আমরা একটা বই বার করতে চাই।'

কোসাম্বি শুরুতে রাজি হচ্ছিলেন না। তাঁর বই কি কেউ পড়বেন? পরে রাজি হলেন। 'Exasperating Essays' বইটি বেরোল। ১৯৫৬ সালে বইটি প্রথম মুদ্রিত হয়। তিনহাজার কপি আড়াই হাজার পেপারব্যাক। দাম দুই টাকা। পুনের বিখ্যাত 'পটবর্ধন প্রেস'-এ বইটি ছাপা হয়।

কেউ সময় মেনে চলতে না দেখলে অধ্যাপক কোসাম্বি খুবই রেগে যেতেন। তিনি যত বড়ই হোন না কেন, ছেড়ে কথা বলতেন না।

কোসাম্বি যখন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃত নিয়ে কাজ করছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে বহু কথা জানতে চাইতেন। কোথাও হয়তো একটা বিশেষ কোনো মূর্তি দেখতে পেলেন। গ্রামের প্রবীণ মানুষদের পূজারী পুরোহিতদের পোষ্টকার্ড পাঠিয়ে নানা কথা জানতে চাইতেন তিনি। সেই তথ্য নিয়ে তিনি তাঁর ইতিহাস ভাবনার আলোকে গবেষণা করতেন। কেমন করে গাঁয়ের নাম থেকে সেই ভূখন্ডের ইতিহাসে চলে যেতেন কোসাম্বি, তা যাঁরা তাঁকে কাজ করতে দেখেছেন, সকলেই জানেন।

একটা বিষয় অনেকদিন ধরেই শ্রী নানে খেয়াল করেছেন। অধ্যাপক কোসাম্বি ওষুধপত্তর তুলনায় একটু বেশিই খেতেন বলে মনে হত তাঁর। আর্থ্রাইটিসে ভুগতেন। প্রচুর অ্যাসপিরিন খেতেন।

যেদিন অধ্যাপক কোসাম্বির প্রয়াণ ঘটে, তার আগের দিন তিনি PPH-এ এসেছিলেন। নানেকে বলেছিলেন, আমাদের দেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও প্রত্যাশিত সফলতা লাভ করেনি। সাতারার নানা পাটিল আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলন। তেলেঙ্গানা আন্দোলন। এর কারণ তিনি খুঁজে বার করতে চান।

হোমি ভাবার সঙ্গে একসময় তাঁর খুবই তিক্তসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কোসাম্বি চাইতেন না, পরমাণু শক্তিকেন্দ্র তৈরিতে অত টাকা খরচ হোক। এই নিয়ে তাঁর একটি লেখাও আমরা এই বইয়ে মুদ্রিত করেছি।

ভাবা একসময় কোসাম্বিকে 'টি আই এফ আর' থেকে অবসর গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তার ছমাস পর কোসাম্বি 'টি আই এফ আর' ছেড়ে দেন।

টি আই এফ আর-এ তিনি যেতেন কেমন করে? বাসা থেকে পুনে রেল স্টেশন পর্যন্ত রোজ হেঁটে যেতেন। তারপর মুম্বাই যাওয়ার জন্যে 'ডেকান কুইন' ধরতেন। এই রেলগাড়ি তাঁর প্রায় বিকল্প ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল। পরে দেখবেন পাঠক, বইয়ের ভূমিকা বা পূর্বকথায় তিনি 'ডেকান কুইন'কে তাঁর ঠিকানা হিসেবে লিখেছেন। বাড়ি থেকে রোজ সকাল ৬-৪০ মিনিটে বেরোতেন। স্টেশনে ৭-১৮ মিনিটে পৌঁছতেন। হ্যাঁ, অতটাই সময় মানতেন তিনি।

তাঁর সংগৃহীত বহু উপকরণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

জীবনাবসানের পর কোসাম্বির ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই পত্র জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা হয়। ওখানে বা আর কোথাও অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তিগত সংগ্রহের তালিকা পাওয়া সম্ভব হয় নি। পেলে নিশ্চয়ই মানুষটির আগ্রহ ও অনাগ্রহের দিক আরও বিস্তৃতভাবে বোঝা যেত।

# কোসাম্বির বইপত্র : প্রাথমিক পরিচিতি

১৯৫৬ সালে পঞ্চাশ বছরে পা দিয়েছেন ডি. ডি. কোসাম্বি। এর মধ্যে তাঁর বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তখনও কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম 'An Introduction to the Study of Indian History'। মুম্বাইয়ের পপুলার বুক ডিপো থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির উৎসর্গপত্র তিনি 'ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর উদ্দেশে' নিবেদন করেছিলেন। মোট দশটি অধ্যায়ে বইটি লিখিত হয়েছে। গৌতম মিত্রের অনুবাদে কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী থেকে 'ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা' শিরোনামে বইটি ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের সূচিপত্র থেকে দশটি অধ্যায়ের শিরোনাম যোগ করছি। পাঠক তাহলে বইটির আলোচ্য বিষয়ের একটি প্রাথমিক পরিসর অনুভব করতে সমর্থ হবেন।

১ লক্ষ্য ও পদ্ধতি

১ ভারত-ইতিহাসের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা
২ প্রাপ্ত উপাদানসমূহ ৩ অন্তর্নিহিত দর্শন

২ শ্রেণী-পূর্ব সমাজের উত্তরাধিকার

১ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব ২ উপজাতীয় সমাজ ৩ উপজাতীয় বিদ্যমানতা ৪ বেতাল ধর্মবিশ্বাস ৫ আঞ্চলিক উচ্চবর্গীয় ধর্মবিশ্বাস ৬ উৎসব ও লোকাচার

৩ সিন্ধু উপত্যকায় সভ্যতা ও বর্বরতা

১ সিন্ধু নগরী ২ সিন্ধুর বাণিজ্য ও ধর্ম ৩ শ্রেণী কাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ৪ খাদ্য উৎপাদন

৪ সপ্তনদের দেশে আর্যরা

১ ভারতের বাইরে আর্যরা ২ ঋগবৈদিক তথ্য ৩ পণি এবং জনগোষ্ঠীসমূহ ৪ বর্ণের উৎপত্তি ৫ ব্রাহ্মণ্য কূলসমূহ

৫ আর্য বিস্তার

১ আর্য জীবনযাপন প্রণালী ২ উপকথা ও পুরাণ বিশ্লেষণ ৩ যজুর্বৈদিক বসতিস্থাপন ৪ পূর্বাভিমুখী সরণ ৫ জনগোষ্ঠী ও রাজত্ব সমূহ ৬ আদিম উপজাতিক বৈশিষ্ট্য ৭ নব্য ব্রাহ্মণ্যবাদ ৮ ব্রাহ্মণ্যবাদ বহির্ভূত লোকাচার, খাদ্য উৎপাদন ও বাণিজ্য ৯ এক আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

৬ মগধের উত্থান

১ নতুন প্রতিষ্ঠান ও সূত্রসমূহ ২ উপজাতি এবং রাজত্ব ৩ কোশল ও মগধ ৪ উপজাতিক ক্ষমতার ধ্বংসসাধন ৫ নতুন ধর্মমতসমূহ ৬ বৌদ্ধধর্ম ৭ পরিশিষ্ট ঃ ছাপ-চিহ্নিত মুদ্রা

৭ গ্রাম-অর্থনীতির উদ্ভব

১ আদি সাম্রাজ্যসমূহ ২ আলেকজান্ডার ও গ্রীকদের ভারত-বিবরণ ৩ অশোকের পথে সমাজ-রূপান্তর ৪ অর্থশাস্ত্র-র প্রামাণিকতা ৫ অশোক-পূর্ব রাষ্ট্র ও প্রশাসন ৬ শ্রেণী কাঠামো ৭ রাষ্ট্রের উৎপাদন-ভিত্তি

৮ বাণিজ্য ও আগ্রাসনের অন্তঃকাল

১ মৌর্যদের পর ২ এক কৃষি-সমাজের কুসংস্কার ৩ বর্ণ ও গ্রাম ; মনুস্মৃতি ৪ ধর্মের বিবর্তন ৫ দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার বসতি ৬ পণ্য উৎপাদক ও বাণিজ্য ৭ সংস্কৃতের বিকাশ ৮ সংস্কৃত সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা

৯ সামন্ততন্ত্র ঃ উপর থেকে

১ আদি সামন্ততান্ত্রিক বিকাশ ২ গ্রাম ও বর্বরতার উদ্ভব ৩ গুপ্তবংশ ও হর্ষের সমকালীন ভারত ৪ ধর্ম ও গ্রাম-বসতির বিকাশ ৫ জমিতে সম্পত্তি অধিকারের ধারণা ৬ পশ্চিম উপকূলে ময়ুরশর্মনের বিলি-বন্দোবস্ত ৭ গ্রামীণ শিল্পী ও কারিগর

১০ সামন্ত্রতন্ত্র ঃ নিচে থেকে

১ ভারতীয় ও ব্রিটিশ সামন্ত্রতন্ত্রে পার্থক্য ২ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বাণিজ্যের ভূমিকা

৩ মুসলমান শাসন ৪ নিচে থেকে সামন্ত্রতন্ত্রের পরিবর্তন ; দাসপ্রথা ৫ সামন্ত্রতান্ত্রিক রাজা,
জমিদার ও কৃষক ৬ অবক্ষয় ও পতন ৭ বুর্জোয় বিজয়

লেখক বইয়ের শুরুতেই বলেছেন, এই বই ভারতের ইতিহাস নয়। ভারতের ইতিহাস যখন কেউ পড়বেন, কেমন ভাবনার আলোকে সেই ইতিহাস পড়তে হবে, সেকথা বলতে চাইছেন। তাঁর দাবি, তিনি বহু উদাহরণ বইয়ে যোগ করেননি। যে কটি করেছেন, পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হবে না। কেন এই বই? গৌতমবাবুর লেখা বাংলা অনুবাদটুকুই যোগ করি।

'কোন কিছুকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে বা বিশ্বাসী চোখে দেখলে চলে না এবং নাক উঁচু ভাব, আবেগতাড়িত সংস্কার...মেকি নেতৃত্বের মানসিকতা ছাড়তে হয়।' এসব জড়িয়ে যে বই লেখা হয়, ডি. ডি. কোসাম্বি তাকে 'অপাঠ্য পাঠ্যবই' ছাড়া ভিন্ন কিছু বলতে রাজি হন নি। ভারতের শ্রেণিবিন্যাসের যথার্থ উপলব্ধি ভিন্ন যথার্থ ইতিহাস রচিত হবে কেমন করে? মনস্বী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে (১৮৮০-১৯৬১) আমরা ভারতের সামাজিক স্তরবিন্যাস বস্তুতন্ত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করতে দেখেছিলাম। 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি' তিন খন্ডে রচনা করেছিলেন বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সেই ধারাকে বহন করেছেন ডি ডি কোসাম্বি। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ফল্গুধারাকে প্রবল স্রোতধারায় বিকশিত করেছেন। সমাজ কখনও স্থবির নয়। সে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সতত চলনশীল। এসকল ঘাতপ্রতিঘাত শ্রেণি উৎসারিত। কেন সমাজের স্বল্পসংখ্যক মানুষ সম্পদভোগ করছেন, সিংহভাগ মানুষ অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে ভুগছেন, অতীন্দ্রীয় বা ঐশ্বরিক চেতনা নয়, শ্রেণিচেতনাই তা যথার্থভাবে বুঝতে সাহায্য করে। ভূমিকায় লেখক কোসাম্বি একথাটাই বলতে চেয়েছেন। ই. এইচ. কার বলেছিলেন, 'কাকে বলে ইতিহাস?' কোসাম্বি বলছেন, ইতিহাস রাজা রাজড়ারা তৈরি করে না। তৈরি করেন সাধারণ মানুষ। এই কথা একজন সৎ ঐতিহাসিককে চিরকাল মনে রাখতে হবে। মানুষের খাবার চাই। সংস্কৃতিও চাই। শুধু উদরপূর্তিতে জীবন চলে না যেমন, শুধু মুক্তিলাভের চিন্তাতেও সমাজ বাঁচে না। দুয়ের সুসংবদ্ধ মিলন চাই। চমৎকার বলেছেন কোসাম্বি। 'আত্মার মালিক কে?', জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু 'জমির মালিক কে?', সেকথাও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করবেন।

১৯৫৬ সালে দেশের স্বাধীনতার এক দশক পার হয়েছে। কোসাম্বি তখনও

মুম্বাইয়ের 'টি. এফ. আই. আর/.'-এ রয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, 'এখন ভারতে যারা শাসন করছে তারা বুর্জোয়া সম্প্রদায়।' হয়তো আমাদের বুর্জোয়ারা বিদেশের বুর্জোয়াদের মত নয়। পাতিবুর্জোয়া গোছের। তবে সরকার পুঁজির যুক্তিহীন তোষণ করে চলেছে। একচেটিয়া অধিকার লাভের লালসাকে কোথাও দমিত করছে না।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা দেখছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। জীবনযাত্রার মানেরও যে বদল ঘটেছে কমবেশি, এ নিয়ে বিতর্ক করার কোনো মানে হয় না। দেশে এখন কৃষক ঋণ শোধ না করতে পেরে আত্মহত্যা করছে। অর্থনীতিবিদ উৎসা পট্টনায়েক হিসাব করে দেখিয়েছেন, মন্বন্তরের সময়ে একজন কৃষক যে দৈনিক আহার্য পেতেন, এখন ছবিটা তার চেয়েও মলিন। তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে সাফদার হাসমি বক্তৃতা দিতে গিয়ে অল্প বছর কয়েক আগে তিনি কথাটা বলেছেন। পুস্তিকা আকারেও বেরিয়েছে। 'পলিটিক্স্ অফ হাঙার', সেই পুস্তিকার শিরোনাম। পাঁচের দশকে ডি. ডি. কোসাম্বি বিষয়টিকে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। বেশি খাবার কম খাবার বলে তিনি থেমে থাকেননি। সাধারণ ভারতীয়দের খাবার গ্রহণের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে, ভারত সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকেই দেখিয়েছেন। এখানে ডি ডি কোসাম্বি শুধু ঐতিহাসিক নন। একজন দক্ষ অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতি বাদ দিয়ে ইতিহাসচর্চা নিরর্থক। যেমন ইতিহাসচর্চা বাদ দিয়ে অর্থনীতির চর্চা বাতুলতা মাত্র।

সামাজিক চিন্তাচেতনার আরও একটি দিক বিষয়ে লেখক তাঁর প্রথম বইয়ের ভূমিকাতেই আমাদের সতর্ক করেছেন। মেঘনাদ সাহা যে অধ্যাপকের কাছে জ্যোতির্বিদ্যার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন, তিনি যখন ভারতীয় মহাকাব্যের ঘটনাবলীতে আধুনিক বিজ্ঞানের 'উজ্জ্বল' উপস্থিতি দেখতে পান, বিজ্ঞানী সাহাকে সতর্ক সঙ্কেত দিতে হয়। 'সবই ব্যাদে আছে' বলার মত লোক ভারতীয় সমাজ থেকে বিলীন হয়ে যায়নি এখনও। বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাকে অমন অবৈজ্ঞানিক ঝোঁকের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, এমন ঝোঁক তথাকথিত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মধ্যেও দেখা যায়। একথা দুঃখ ভরে উচ্চারণ করেছেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার, পুষ্প ভার্গব প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। হ্যাঁ, এই কথাটাই বহু দশক আগে বলে গিয়েছেন ডি ডি কোসাম্বি। পুরাণকথাকে যেন অহেতুক 'প্রত্যক্ষ যুক্তিসম্মত' করে না তোলা হয়। একেই বলা হয় ইউহেমারিজম (Euhemerism)।

বইটির যে ভূমিকা লিখেছেন লেখক, তার ঠিকানা ডেকান কুইন। তারিখ ডিসেম্বর ৭, ১৯৫৬।

বইটির যখন পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, লেখক বলেছেন, এমন ইতিহাস অনুসন্ধানে তিনটি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখতে হয়। প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব।

বিজ্ঞান সমাজ দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ক একগুচ্ছ প্রবন্ধের সংকলন হিসেবে 'Exasperating Essays' বইটি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটির ভূমিকা লিখেছেন যখন, ডি. ডি. কোসাম্বি 'ডেকান কুইন' এর ঠিকানাই দিয়েছেন। ভূমিকা লেখার তারিখ ২রা অক্টোবর, ১৯৫৭। গান্ধীজীর জন্মদিন তাঁর ভাবনায় কাজ করছিল কি না কে জানে! এই সংকলনে এমন কতগুলো রচনা রয়েছে যা আমাদের মনে যেমন ভাবনার খোরাক জোগায় তেমনি বিতর্কও তৈরি করে। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক রচনা জিজ্ঞাসু মনে বিতর্কের জন্ম দেবে-এই তো স্বাভাবিক। ভারতের মহাবিদ্রোহের দেড়শোবছর অতিক্রম করেছি আমরা। এই নিয়ে আমাদের দেশের ঐতিহাসিকেরা প্রচুর মননশীল নিবন্ধ ও পুস্তক লিখেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, যখন কোসাম্বি সতেরো বছরের ছাত্র, হার্ভার্ডে রয়েছেন, মহাবিদ্রোহের উপর এক ভিন্নধর্মী রচনা লেখেন। কিশোর বয়সের রচনা। পরে তিনি রচনাটিকে সংশোধন করেন। আয়তন বাড়িয়ে ১৯৩৯ সালে 'Fergusson and Willingdon College Magazine' এ ছাপান। কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এই রচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে চাপা পড়ে যায়। এখন আবার এই নিবন্ধের প্রসঙ্গ ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করছেন। কী এই রচনার বৈশিষ্ট্য? ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের একটি নিবন্ধকে (দি হিন্দু, নভেম্বর ৮, ২০০৭) আমরা আলোচনার অবলম্বন হিসেবে নির্বাচন করেছি। নিবন্ধটির শিরোনাম '1857 : What does it mean to us ?'। এই নিবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য, 'Half a century ago D. D. Kosambi–whose birth centenary merits celebration at the national level–characterised the great uprising as 'feudal' and yet the final verdict on its significance was positive and it was perceived as a glorious struggle.' অধ্যাপক ভট্টাচার্য কোসাম্বির চিন্তাসূত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন এমন কথা বলে, "He wrote admiringly of the proletarian heroes' who shed their blood in 1857 but he did not

fail to note the 'fratricidal loyalty' to the British displayed by some Indian sepoys whose 'sword opened the first secure path for the grimy civilisation of Birmingham, Manchester and Sheffield in many an unhappy corner of the world." তীক্ষ্ণ শ্রেণিচেতনার আলোকেই কোসাম্বি সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। পরাধীন ভারতের শ্রেণিচরিত্রই তাঁর বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মুখ্য মানদন্ড। যদিও পরবর্তী কালে 'মান্থলি রিভিউ'-এর এক সংকলিত সংগ্রহে (১৯৫৪ সাল) কোসাম্বি উচ্চারণ করেছিলেন, 'Indian feudalism tried its strength against the British bourgeoisie for the last time in the unsuccessful rebelion on 1857" (Monthly Review, vol VI, New York)। 'সিপাহী বিদ্রোহ' কতটা 'জনগণের বিদ্রোহ' ও কতোটা 'সিপাইদের বিদ্রোহ' এই নিয়ে বিতর্কের সমাধা হয়নি আজও। তবে বিস্তৃত নথিপত্র ও লেখালেখি পড়ে মনে হয়, সিপাহী বিদ্রোহের অবশ্যই একটা গণচরিত্র ছিল। এবিষয়ে ঐতিহাসিকেরা আলোকপাত করবেন। তবে ঐতিহাসিক রমিলা থাপারের একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অভিমত, 'Kosambi made a new paradigm for studying Indian History.' কোসাম্বি জানতেন, তাঁর লেখাগুলো বিতর্ক তৈরি করবে। তাই বইয়ের শিরোনামেই তিনি এই বিশেষণ জুড়েছিলেন। অন্যান্য রচনার বিষয়গুলো একটু দেখে নিতে চাই আমরা। যখন কোনো গণআন্দোলন সংগঠিত হয়, তখন সেই আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব কেমন করে অগ্রসর হবেন, সেই বিষয়ের নিবন্ধ রয়েছে। ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ নিয়ে লেখা রয়েছে। স্বভাবতই এসেছে ভারতের শ্রেণিকাঠামো ও শ্রেণিচরিত্র বিষয়ক রচনা। চীন বিপ্লবের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। কেন বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন ঘটেছে এই নিয়েও তাঁর আলোচনা রয়েছে। প্রিয় পাঠকবন্ধুদের অনুরোধ করব, বইটি সংগ্রহ করে অবশ্যই তার ভূমিকাটি পড়বেন। একটি স্বাধীন উঁচু মানের নিবন্ধ বলেই মনে হয়। বলেছেন কোসাম্বি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকেই তাঁর ওই নিবন্ধগুলি রচিত। যাঁরা বলছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কারের বিষয়ে মার্কসবাদ আলোচিত হতে পারে, বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হতে পারে না, তাঁদের কোসাম্বি জবাব দিয়েছেন এই বইয়ের ভূমিকায়। স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, মার্কসবাদ শুধু অতীতকে ব্যাখ্যা করে না, ভবিষ্যতের পথ নির্বাচনের দিকনির্দেশ তৈরি করে। কখনও কোনো গোঁড়ামি নয় মার্কসবাদ। তর্ক তুলেছেন কোসাম্বি, ঊনবিংশ শতাব্দীর

বিষয় হলেই সব কিছু বাতিল হয়ে যায় না কি? তবে গাউস, ফ্যারাডে বা ডারউইনকে আমরা আজও পড়ছি কেন?

কোসাম্বির কথাতেই শুনুন। 'বলা হয়, মার্কসবাদ হিংসাশ্রয়ী এবং এর ভিত্তিটাই শ্রেণি সংগ্রামের উপর — যার উপর এখনকার সেরা লোকজনের কোনো আস্থা নেই।' তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেছেন এমন মনোভাবনার লোকজনদের।

'আবহবিদ্যার ঘোষণাই কি পৃথিবীতে ঝড় তৈরির উৎসাহ দান করে?' মনে রাখতেই হয় আমাদের, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন অতুলনীয় বিদ্বান মানুষ ডি ডি কোসাম্বি। তিনি বলেন, 'পবিত্র গীতায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে, কোনো মার্কসীয় গ্রন্থই যুদ্ধকে তেমন চোখে দেখে না। যুদ্ধের জন্য যারা প্রস্তুতি নেয়, যারা হত্যাকান্ডে সম্মতি জ্ঞাপন করে, মার্কসবাদ তাদের পক্ষে কখনও সওয়াল করেনি।'

মার্কসবাদকে কোসাম্বি অন্ধের মত ব্যবহার করতে বারবার বারণ করেছেন। কেননা মার্কসবাদ ধর্মে সচল। একদেশিকতা তার ধর্ম নয়।

লেখাগুলো নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সংকলিত করার কাজে সহযোগিতা করেছেন বলে শ্রীমতি ভি. ভি. ভাগবত ও শ্রী আর. পি. নেনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পরে আমরা আর কী নেনের একটা সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করব।

তাঁর লেখা যে বইটি আজও মানুষ ইতিহাসের বিকৃতি ও বিচ্যুতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন, সেই বইয়ের নাম 'Myth and Reality : Studies in the Formation of Indian Culture'। বইটির স্বত্ত্বাধিকারী হিসেবে আমরা কন্যা মীরা কোসাম্বির নাম দেখতে পাচ্ছি। বইটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হবার পর ১৯৮৩, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৮ ও ২০০৫ সালে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নির্দেশিকা সহ ১৮৭ পৃষ্ঠার বই। প্রচুর অলঙ্করণ রয়েছে বইটিতে। বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় সূচিপত্র থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন। আমরা দুএক কথা বলে সূচিপত্রটি যোগ করব। মোট পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে এই বইয়ে। ভূমিকা তো রয়েছেই যা তাঁর বইয়ের বেলায় অবশ্য পাঠ্য মনে হয়। ভগবত গীতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা আলোচনা করেছেন। কালিদাসের রচনার আলোকে সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত চরিত্রদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। একটি অধ্যায়ের শিরোনামে 'পিলগ্রিম প্রগ্রেস' কথাটা

ব্যবহার করেছেন কোসাম্বি। এই বই তিনি পড়তে যে খুব ভালোবাসতেন, নানা পংক্তি তাঁর মুখস্থ ছিল, আগের একটি অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি।

বইয়ের ভূমিকাটি শুরুই করেছেন কোসাম্বি এভাবে। 'সাহিত্যে যা লেখা রয়েছে, বাস্তব অনুসন্ধানে তার মিল-অমিল দেখতে চেয়েছিলাম। এই বইয়ের সবকটি নিবন্ধই তাই অনুসন্ধানমূলক।' ভারতীয় দর্শনের মহত্ত্ব কি কুসংস্কার বাঁচিয়ে রাখার কাজে ব্যবহৃত হবে? ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোসাম্বি। কী চমৎকার তাঁর যুক্তির ক্ষমতা ও বাক্য বিন্যাস, মুগ্ধ না হয়ে উপায় থাকে না। ছোট্ট একটি লাইন যোগ করছি আমরা।

'Anyone with aesthetic sense can enjoy the beauty of the lily ; it takes a considerable scientific effort to discover the physiological process whereby the lily grew out of the mud and filth'.

কেন এমন একটা বইয়ের কথা ভেবেছিলেন কোসাম্বি? ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচুর 'myth' ও 'ritual' রয়েছে। তার উৎস খুঁজতে চেয়েছেন। কেন? নইলে ভারতীয় ইতিহাসের বিকৃতি রোধ করা যাবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়েও ভুল ধারণা তৈরি হবে। সেখানে দেখা দেবে ঈশ্বরতত্ত্বের প্রাবল্য। বস্তুবাদের ভাবনা তো বহুযোজন দূরে।

সূচিপত্র

I. SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE BHAGAVAD-GITA

1. For What Class? 2. A Remarkable Interpolation 3. Not Sufficient Unto the Purpose 4. Why Kṛṣṇa? 5. When Does A Synthesis Work? 6. The Social Functions of Bhakti 7. The Gitā Today

II. URVASI AND PURŪRAVAS

1. Introduction 2. Kālidāsa's Treatment 3. Modern Interpretations 4. Versions of the Story 5. Ṛgveda x 95 6. Commentary to RV x 95 7. Urvasi's Associates 8. The Dawn-goddess in the Ṛgveda 9. Aryan or Pre-Aryan 10. Goddess of birth and Death

III. AT THE CROSSROADS : A STUDY OF MOTHER-GODDESS CULT SITES

1. The Problem 2. The Mothers 3. Information from Field-work

4. Primitive Tracks 5. The Trade Routes 6. The Jātakas 7. Cārudatta's Sacrifice

IV. PILGRIM'S PROGRESS : A CONTRIBUTION TO THE PREHISTORY OF THE WESTERN DECCAN PLATEAU

1. The End of Pre-history in the Deccan 2. Cult Migrations, The Goddesses and Megaliths 3. Cult Migrations, The Gods 4. Microlith Tracks 5. Highlanders and Lowlanders 6. Later Developments 7. Towards Agriculture.

V. THE VILLAGE COMMUNITY IN THE 'OLD CONQUESTS' OF GOA

1. Land and People 2. The Economic Situation 3. Heterogeneity of the Population 4. The Feudal Period.

কোসাম্বি রচিত চতুর্থ বইটির শিরোনাম 'The Culture and Civilisation Of Ancient India in Historical Outline'। এই বইয়ের অধ্যায় সংখ্যা সাত। বইটির প্রকাশকাল ১৯৬৫। এখানে তিনি বড় আকারে ভূমিকা রচনা করেননি। শুধু 'পূর্বকথা' খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে যোগ করেছেন। বইয়ের স্বত্ত্ব তাঁর নিজের-ই। বইটির 'পূর্বকথা' আমরা বাংলা অনুবাদে পেশ করতে চাইছি।

'নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে ইতিহাস রচনার চেয়ে ইতিহাসের বদল ঘটানো অনেক বেশি জরুরি। যেমন আবহাওয়া নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে এই বিষয়ে কিছু করা সব সময়েই ভাল। আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে হয়তো প্রতিটি নাগরিক-ই মনে করেন যে তিনি ইতিহাস গড়তে সহায়তা করছেন, কেন না, তার ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বাক্যবাগীশের ভূমিকা পালন করছেন ও সুবিধেভোগীদের আরও সুবিধের জন্য তার উপর আয়কর চাপাচ্ছেন। কেউ কেউ এখন এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। তাদের ধারণা হচ্ছে, আরও কিছু না করলে পারমাণবিক যুগের এই পৃথিবীর ইতিহাস যে কোনো মুহূর্তে হঠাৎ করে থেমে যেতে পারে। তথ্য নেই, সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ নেই, ভারতের উজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে নিরন্তর সাফাই গাওয়া হচ্ছে। ভারতের নির্বাচনের খোলামেলা চেহারার চেয়েও এই বিষয়টি আরও বেশি খোলামেলা মনে হয়। অস্পষ্ট সন তারিখের উপর ভিত্তি করে আলোচনা চলছে। যাদের জীবন সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট তথ্য নেই, সেই সব সম্রাট ও ভবিষ্যৎবক্তাদের উপর জীবনী রচিত হচ্ছে। আমার মনে হল, ভারতীয় ইতিহাসের

মূল ধারাগুলোকে সাজালে কিছু একটা লাভজনক হতে পারে। মূল উপাদানের বিষয়ে এই দেশে গুরুত্ব না থাকলেও, অন্যান্য দেশে মূল উপাদান ভিন্ন ঐতিহাসিকেরা কাজ করার কথা ভাবতেই পারেন না। এমন বৌদ্ধিক ভাবনা থেকেই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি।'

তিনি এরপর এই পূর্বকথায় কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এঁরা হলেন জন আরউইন, অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশম। বিখ্যাত আলোকচিত্রী সুনীল জানা আদিবাসী জীবনের যে ছবি সংগ্রহ করে দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মানচিত্র বিশেষজ্ঞ মার্গারেট হল ও সোভিয়েত নথিপত্রের জন্য সেমিয়ন তাইয়োলেভের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সবশেষ লাইনটির কথা বিশেষভাবে বলতে চাই, কোসাম্বি লিখছেন, 'যে বন্ধুরা আমার পদ্ধতির উপর আস্থাশীল আমি অল্পকথায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অক্ষমতা স্বীকার করছি।'

প্রিয় পাঠক, 'পদ্ধতি' শব্দটির দিকে আমরা জোর দিতে চেয়েছি। যখন বইটি বেরিয়েছে, সেখানে তিনি এবার আর 'ডেকান কুইন' ঠিকানা দেননি। এখানে তাঁর ঠিকানা 'হাউস ৮০৩, পুনা-৪, ভারত। জুলাই ৩১, ১৯৬৪।' এই বইটিকে ভারতের প্রথম যথার্থ সাংস্কৃতিকে ইতিহাস হিসেবে গণ্য করা হয়। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ অসংখ্য উপকরণের সহায়তায় আলোচিত হয়েছে। প্রশ্ন তুলেছেন তিনি অনেক। খাদ্য সংগ্রহ ও কৃষিজীবন-ই কি নতুন ধর্ম বিকাশের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি করেছে? কেন সিন্ধু সভ্যতার স্থাপত্য এমন করে নিশ্চিহ্ন হল যা থেকে কিছুই স্পষ্ট অনুমান করা যায় না? ভারতের জাতিভেদ প্রথা সত্যিই কি কখনো কোন উপকারে লেগেছে? রোম ও গ্রিসদেশে আমরা ক্রীতদাস প্রথা দেখেছি, আমাদের দেশে এই প্রথা গড়ে উঠেনি কেন? কেন বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও অন্যান্য সমজাতীয় ধর্মগুলো একই সময়ে একই ভূখন্ডে জন্মলাভ করেছে? এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃত অংশ জুড়ে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটল অথচ যেখানে এই ধর্মের উৎপত্তি, সেই ভারতে এই ধর্মের প্রাবল্য ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ল কেন? মগধ সাম্রাজ্যের উদ্ভব ও পতনের কারণগুলোই বা কী কী? মৌর্যরাজত্ব কি পূর্বসুরীদের শাসনের মতই ছিল, না চরিত্রে ছিল খানিকটা ভিন্ন? এমন সব প্রশ্ন এই বইয়ে গভীরভাবে উত্থাপিত হয়েছে।

এখানেও আমরা বইটির সূচিপত্র যোগ করতে চাই। নিবিড় পাঠক আরও স্পষ্ট করে কোসাম্বি কেমন বিষয়ে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গবেষণা করেছেন, বুঝতে সামর্থ হবেন।

THE HISTORICAL PRESPECTIVE

*The Indian Scene*
*The Modern Ruling Class*
*The Difficulties Facing the Historian*
*The Need to Study Rural and Tribal Society*
*The Villages*
*Recapitulation*

PRIMITIVE LIFE AND PREHISTORY

*The Golden Age*
*Prehistory and Primitive Life*
*Prehistoric Man in India*
*Primitive Survivals in the Means of Production*
*Primitive Survivals in the Superstructure*

THE FIRST CITIES

*The Discovery of the Indus Culture*
*Production in the Indus Culture*
*Special Features of the Indus Civilisation*
*The Social Structure*

THE ARYANS

*The Aryan Peoples*
*The Aryan Way of Life*
*Eastward Progress*
*Aryans after the Rigveda*

*The Urban Revival*
*The Epic Period*

FROM TRIBE TO SOCIETY

*The New Religions*
*The Middle Way*
*the Buddha and His Society*
*The Dark Hero of the Yadus*
*Kosala and Magadha*

STATE AND RELIGION IN GREATER MAGADHA

*Completion of the Magadhan Conquest*
*Magadhan Statecraft*
*Administration of the Land*
*The State and Commodity Production*
*Asoka and the Culmination of the Magadhan Empire*

Towards Feudalism

*The New Priesthood*
*The Evolution of Buddhism*
*Political and Economic Changes*
*Sanskrit Literature and Drama*

অনেকদিন পর ২০০২ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আমরা ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা ও সম্পাদনা সহ ডি. ডি. কোসাম্বির লেখা মোট তি প্লান্নটি নিবন্ধের একটি সংকলন গ্রন্থ পেয়েছি। বলতে দ্বিধা নেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়। রচনাগুলিকে তিনি বিষয়ের সাযুজ্য অনুসারে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি বিষয়ক চারটি নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, কী কী বিষয়কে কোসাম্বি ইতিহাসের আলোচনার অঙ্গনে এনেছেন। তেমন বিষয় নিয়ে আঠারোটি নিবন্ধ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত। বারোটি নিবন্ধের সমাহার এই অধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে কোসাম্বির লেখা প্রাচীন সাহিত্য নির্ভর নয়টি নিবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সবশেষ অধ্যায়টিও কম আকর্ষণীয় নয়। বিভিন্ন নিবন্ধের সূত্র ধরে কোসাম্বি যে প্রত্যুত্তর রচনা করেছেন ও যে সকল বই তিনি সমালোচনা

করেছেন তার কয়েকটি নির্বাচিত লেখার সংকলন এই সবশেষ অধ্যায়। নিবন্ধের সংখ্যা মোট দশ।

বলাই বাহুল্য, বই চারটির কথা বাদ দিলেও এই সংকলনে 'সমগ্র কোসাম্বি' ধৃত হয়নি। এমন কোনো অপরিহার্যতাও নেই। যেভাবে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নিবন্ধগুলোকে প্রচুর সংকেত সূত্র ও ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করেছেন, গ্রন্থটি কোসাম্বি চর্চার অন্যতম প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবেই দীর্ঘকাল বিবেচিত হবে।

এখানেও আমরা প্রবন্ধগুলির তালিকা পেশ করব। কোন প্রবন্ধটি কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, এই বইয়ের শেষে রচনাপঞ্জি দেখলেই স্পষ্ট হবে।

SECTION I

*Concerning Method*

Combined Methods in Indology
Living Prehistory in India
On a Marxist Approach to Indian Chronology
Stages of Indian History

SECTION II

*Themes in History*

The Vedic 'Five Tribes'
Early Brahmins and Brahminism
On the Origin of Brahmin *Gotras*
Development of the *Gotra* System
Brahmin Clans
Early Stages of the Caste System in Northern India
The Beginning of the Iron Age in India
Ancient Kosala and Magadha
The Line *Arthaśāstra* Teachers
Kaṇiṣka and the Śaka Era
The Working Class in the *Amarakośa*
Origins of Feudilism in *Kaśmir*
The Basis of Ancient Indian History (I)
The Basis of Ancient Indian History (II)
The Autochthonous Element in the *Mahābhārata*

The Avatara Syncretism and Possible Sources of the Bhagavad-Gita
The Historical Krishna
The Study of Ancient India Tradition

SECTION III

*Archaeology, Epigraphy, Numismatics and Ethnography*

Piereced Microliths from the Deccan Plateau
Megaliths in the Poona District
Prehistoric Rock Engravings Near Poona
Staple 'Grains' in the Western Deccan
Dhenukakata
The Buddhist Caves of Western India
Notes on the Kandahar Edict of Asoka
Indian Feudal Trade Charaters
An Inscription at Palasdev of Saka 1079
Asokan Pillar : Banaras Mystery
Scientific Numismatics
'Indo-Aryan' Nose Index

SECTION IV

*Texts, Words and Literary Criticism*

On the Authoriship of the *Śatakatrayi*
Some Extant Versions of Bhartṛhari's *Satakas*
The Parvasaṃgraha of the *Mahabharata*
Parvasamgraha Figures for the Bhiṣmaparvan of the *Mahabharata*
The Sanskrit Equivalents of Two Pali Words
The Text of the *Arthaśastra*
The *Cintāmaniśāranika* of Daśabala
The Quality of Renunciation in Bhartṛhari's Poetry
Introducing Vidyakara's *Subhāṣitratnakoṣa*

SECTION V

*Reviews and Rejoinders*

The Emergence of National Characteristics Among

Three Indo-European Peoples
Race and *Immunity in India*
Caste and Class in India
Geldner's Ṛegveda
Marxism and Ancient Indiam Culture
What Constitutes Indian History
The Basis of Despotism
On the Development of Feudalism in India
Primitive Communism
On Valid Tests of Linguistic Hypotheses

এই বৃহদায়তন গ্রন্থটি বিষয়ে আর দু একটি কথা উল্লেখ করতে চাইছি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ নিবন্ধ তিনটি কোসাম্বির প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয়েছে। বাকি লেখাগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে এই প্রথম সন্নিবদ্ধ হল। ঐতিহাসিকেরা নানা ধারায় ইতিহাস চর্চা করেন। মনে পড়ছে আমাদের, ভারতীয় বিদ্যাভবন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মশাইকে মুখ্য সম্পাদক করে একাধিক খন্ডে 'The History and Culture of Indian People' প্রকাশ করেছে। সেই ধারাবাহিকের প্রথম তিনটি খন্ড কোসাম্বিকে সমালোচনার জন্য দেওয়া হয়।

ছোটবেলায় আমরা ইতিহাস বইয়ের পাতায় 'হিন্দু যুগ' 'মুসলমান যুগ' এসব শিরোনাম পড়েছি। পরে অবশ্য 'প্রাচীন যুগ', 'মধ্য যুগ', 'আধুনিক যুগ' এভাবে শ্রেণিবিভাজিত হয়েছে। কোসাম্বি বলতেন, ঐতিহাসিকদের কয়েকটি 'period' না বলে একাধিক 'period'কে একসঙ্গে কয়েকটি 'advance' বলাই ভাল। ভারতের ইতিহাসে এক 'period' পেরিয়ে অন্য 'period' এসেছে, এমন ব্যাখ্যায় কোসাম্বির বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। যখন অভিমতের বিরোধিতা করতে

হচ্ছে, স্পষ্টভাবেই তার বিরোধিতা করতেন। যেমন ধরা যাক তাঁর লেখা নিবন্ধ 'What Constitutes Indian History'।

যে তিনটি খন্ড কোসাম্বি সমালোচনা করেছিলেন তাদের নাম নীচে দেওয়া হল।

১. The History And Culture of The Indian People : vol

I, The Vedic Age (1951).

২. The History And Culture of the Indian People : Vol II, The Age of Imperial Unity.

৩. The History And Culture of the Indian People : Vol III, The Classical Age.

শুরুই করেছেন কোসাম্বি একটি ভিন্ন সুরে। ভারতের নতুন ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়েছে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী মাথায় রেখে লেখা হবে। টাকা পয়সা যাঁরা দিচ্ছেন, সিংহভাগই ব্যবসাকর্মে নিয়োজিত। তবে ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে প্রাজ্ঞ মানুষেরাই এই বইগুলি লিখছেন। বলা প্রয়োজন, বইগুলোকে সব মিলিয়ে কোসাম্বি ভাল বলতে পারেননি। মাঝে 'চড়াসুরে' মন্তব্য পেশ করেছেন। যেমন একজায়গায় প্রথম খন্ডের বিষয়ে লিখছেন, 'The calibre of analysis is uniformly low, so-ordination poor among the contributors.'

সিন্ধুসভ্যতা কি আর্যপূর্ব না আর্যপরবর্তী সভ্যতা? এই নিয়ে লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবল তফাত লক্ষ্য করেছেন কোসাম্বি। গর্ডন চাইল্ডকে ভুল ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে মূল নথি দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের একটি নিবন্ধ ছিল যার সম্পর্কে কোসাম্বি শ্রদ্ধাশীল। তাই তিনি সুনীতিকুমারের অভিমত পেশ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'Dr. Suniti Kumar Chatterji favours us with the following pearl of wisdom'. 'মুসলমান যুগ'-এর অতিশয়োক্তি দেখে কোসাম্বি ক্ষোভ ও পরিহাস মিলিয়ে লিখেছিলেন, 'In the preliminary remarks to the first volume, both K. M. Munshi (Who wrote the foreword to each volume) and R. C. Majumder (the chief editor) dismiss with contempt the nomenclature of the 'so-called Muslim period', it may be correct to eliminate the term altogether from Indian histories, but the proposal is surprisingly incongruous when made by *two Hindus with good Muslim professional names, Munshi and Majumder'*.

যখন বিদ্যাভবন প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থের দার্শনিক দারিদ্র্যের কথা বলছেন, বস্তুবাদী তত্ত্বের যথার্থ বিশ্লেষণ খুঁজে না পেয়ে ওই সময়কার সুপরিচিত মার্কসবাদী রাজনীতিবিদ এস. এ. ডাঙ্গের লেখা একটি বইয়েরও বিরূপ সমালোচনা করেছেন কোসাম্বি। তাঁর সমালোচনা বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন। কিন্তু দর্শনকে

গোঁড়ার মত আঁকড়ে না থেকে মুক্ত বুদ্ধি থেকে বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করতেন কোসাম্বি, আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। কোসাম্বির সমালোচনামূলক নিবন্ধটির নাম 'Marxism and Ancient Indian Culture'। ১৯৪৯ সালে ডাঙ্গের লেখা একটি বই পিপল্‌স্ পাবলিশিং হাউস বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম 'India from Primitive Communism to Slavery'।

বিশ্বাস করতে চাইবেন পাঠক, কিভাবে বইটির সমালোচনা শুরু করেছিলেন তিনি?

'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা যে গভীর হতাশাব্যঞ্জক বইটি লিখেছেন তা সমালোচনার যোগ্য নয়। কিন্তু যদি নীরবতা অবলম্বন করি, মার্কসবাদ বিষয়ে মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা গড়ে উঠবে।...বইটির সম্মুখ প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে পশ্চাৎপ্রচ্ছদ পর্যন্ত যা লেখা রয়েছে, সবই বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। আমার বর্তমান সমালোচনাটিকে গঠনমূলক সমালোচনা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।'

কোসাম্বি যা বলতে চাইলেন তা অনেকটা এরকম। ডাঙ্গে তাঁর আলোচনায় এদেশের নতুন উঠতি বুর্জোয়াদের একটা সামান্য অংশকে চিহ্নিত করেছেন। Tilak, Rajwade ও Kunte যে পথে বুর্জোয়াশ্রেণির উদ্ভব বিচার করেছেন, তিনি ভিন্নপথে হাঁটেননি। এঁরা সব 'বৈদিক পন্ডিত'। শুধু মারাঠিদের মধ্যে খুঁজলেও তো ডাঙ্গে ভেলঙ্কারের মত একজন প্রকৃত বিদ্বানের সন্ধান পেতেন।

প্রতিটি পৃষ্ঠায় বইটি প্রস্তুতির দারিদ্র্য তাঁর চোখে এসেছে। সত্যি কথা যদি বলতে হয়, বইটিকে পুরো খোলনলচে বদলে দিয়ে নতুন করে লেখা উচিত। হ্যাঁ, এমন-ই বলেছেন কোসাম্বি। বলেছেন সচেতনভাবে, মুদ্রণ প্রমাদ বা নির্মাণগত ত্রুটি নিয়ে তাঁর অত চিন্তা নেই।

বইয়ের শিরোনামে কোসাম্বির ঘোরতর আপত্তি দেখা গিয়েছে। ভারতে কখনো ক্রীতদাস প্রথা ছিল বলে কোসাম্বি মনে করেন না। তবে কেন বইয়ের নাম এমন হবে? এমনভাবে একজন মানুষ বলতে পারেন কখন?

'Because of the caste system, India had helotage, not slavery. Thus Dange's very title is wrong, for his sources contain neither primitive communism nor slavery.' ডাঙ্গে কোথাও ব্যাখ্যা করে

বলেননি, কেন জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় আর্যসভ্যতায় দেখা গেল, আর কোথাও দেখা গেল না। ভগবত-গীতা থেকে শ্রেণিসংগ্রামের কথা আহরণ করলে এমনটা হয়।

তারপর প্রায় সাথে সাথেই কোসাম্বি বলেছেন, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি মার্কসবাদ দিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সবচেয়ে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

মার্কসবাদ কোন বিকল্প চিন্তা নয়। বিশ্লেষণের হাতিয়ার। সামান্য দক্ষতা ও বুদ্ধি আহরিত না হলে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটানো যায় না। মার্কস এঙ্গেলস থেকে উদ্ধৃতি দিলেই চলে না।

মানুষের রাজনৈতিক জীবন ও বৌদ্ধিক উপলব্ধি যে পরস্পরবিরোধী নয়, ডাঙ্গের জীবনকাহিনি ও কোসাম্বির উল্লিখিত আলোচনা থেকে কি আমরা সূত্রায়িত করতে পারি?

বহু আলোচিত চারটি বইয়ের কথা আমরা অত্যন্ত স্বল্পপরিসরে আলোচনা করলাম। নব্বইয়ের দশকে তাঁর নির্বাচিত রচনার অন্তত দুটো সংকলন আমাদের হাতে রয়েছে। ১৯৮৫ সালে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এ. জে. সঈদের সম্পাদনায় 'D. D. Kosambi on history and Society : Problems of Interpretation' শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। তার পরের বছর, ১৯৮৬ সালে কোসাম্বির সমাজ বিজ্ঞান ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কিত একগুচ্ছ রচনা 'Science, Society and Peace' শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের রচনাগুলির তালিকা আমরা পেশ করতে চাই। বইয়ের একটি অধ্যায়ে তাঁর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত ভাবনা নিয়ে লেখা থাকলেও এই তালিকা তাঁকে বুঝতে আরও বেশি সহায়ক হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বইটি পুনে থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির দাম পঞ্চাশ টাকা।

*An Autobiographical Account*
Steps in Science
*Science and Society*
Science and Freedom
The Social Function of Science : Review

Problems of Science and Technology in Underdeveloped Countries
The Scientific Attitude and Religion
Sin and Science Introduction
Revolution and the Progress of Science
Soviet Science : What can it Teach us
Nuclear Threat and Peace
Nuclear Warfare : The Real Danger
Imperialism and Peace

*The Energy Question*
Atomic Energy for India
Sun or Atom
Solar Energy for Underdeveloped Areas

*On Two Great Scientists*
Einstein : Passionate Adventurer
G. D. Birkhoff : A Tribute

মোট চৌদ্দটি লেখার সংকলন এই বই। লেখাগুলির শিরোনাম দেখলেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। দুটো বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাইছি। প্রথমত, শক্তির প্রশ্নে কোসাম্বি গভীরভাবে ভেবেছেন। পরমাণু শক্তি ও সৌরশক্তি উভয় বিষয়েই নিবন্ধ রচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, দুজন বিজ্ঞানীর স্মৃতিচারণ করেছেন কোসাম্বি। একজন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। দ্বিতীয় বিজ্ঞানীর নাম জি. ডি. বার্কহফ। বার্কহফের পরিচিতি আমরা এই বইয়ে দিয়েছি। বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সমাজ প্রসঙ্গে কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উত্থাপন করেছেন ডি ডি কোসাম্বি। কয়েকটি প্রশ্ন আমরা পরপর লিখতে পারি।

এক : বিজ্ঞান কি?

দুই : বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজের গঠনের উপর কেমনভাবে নির্ভরশীল?

তিন : অনুন্নত দেশে কেমন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা পরিচালিত হবে?

চার : পরমাণু শক্তি গবেষণার চেয়েও সৌরশক্তি গবেষণা ভারতের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় কেন?

পাঁচ : নিউক্লিয় শক্তির প্রকৃত বিপদ কোথায়?

ছয় : মানুষের ভবিষ্যতের নিরিখে একজন বিজ্ঞানীর মহত্ত্ব ও অবদান আমরা কেমনভাবে বিবেচনা করব?

সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর কোসাম্বির লেখা উপরিউল্লিখিত নিবন্ধগুলিতে লুকিয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে নিয়ে তাঁর লেখা নিবন্ধটি এবং পুনের রোটারি ক্লাবে পঠিত ও পরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত 'Atomic Energy for India' আমরা বইয়ের পরিশিষ্টে যোগ করেছি।

# একটি ধ্রুপদী গ্রন্থের সমালোচনা

Social Function of Science, J. D. Bernal, FRS, pp xvi+482, Routledge & Sons, 1939, Price Sh.12/6

*জে. ডি. বার্নালের বিখ্যাত বই 'সোশ্যাল ফাংশন অফ সায়েন্স'-এর সমালোচনা লিখেছিলেন ডি. ডি. কোসাম্বি। সমালোচনাটি, আগেই বলেছি, 'ন্যাশনাল ফন্ট কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এখানে তার পূর্ণ বাংলা অনুবাদ পেশ করছি।*

বইটির জ্যাকেটে এমন দুটো লাইন লেখা রয়েছে যা সমালোচকের পরিশ্রম পূর্ণমাত্রায় লাঘব করে দেয়। 'বিজ্ঞান কী করে? বিজ্ঞান কী করতে পারে?' বইটির ভেতরে রয়েছে নিখুঁত বর্ণনা, এক ব্যতিক্রমী প্রশংসনীয় কাজ। একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনুধাবনে ব্রতী হয়েছেন। যে সময় ও শ্রম দিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক সমস্যার গবেষণায় নিরত থাকেন, একইরকমভাবে তিনি এই কাজ করেছেন। বিষয়ের প্রতিটি দিক তিনি অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ কাঠামো রচনা করে যার যেখানে অবস্থান, যথার্থভাবে পরিবেশন করেছেন। এ সময়ে যারা বিজ্ঞান পড়তে চান, তাদের সকলের কাছে এ এক অতি মূল্যবান পুস্তক হিসাবে গ্রাহ্য হবে। বইয়ের শেষে যে অতিরিক্ত সংযোজনী রয়েছে তার গুরুত্বও কম নয়।

নাতিদীর্ঘ সমালোচনা এই বইয়ের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করে না। কিন্তু লেখকের পান্ডিত্যের প্রশংসা না করে উপায় নেই। তিনি যে শুধুমাত্র গবেষণা সংগঠন সমূহের যথার্থ পরিচিতি পেশ করেছেন তাই নয়, ব্রিটিশ নেতৃত্ব ওই সব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কেমন মনোভঙ্গী পোষণ করতেন তার বিবরণও পেশ করেছেন। বিজ্ঞান কেমন ভাবে সুসংবদ্ধ হয় (অথবা হয় না), প্রতিটি দেশের উদাহরণ টেনে এনে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রতিটি দেশ বিজ্ঞান প্রসারে কেমন শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে তার হিসেবে দিয়েছেন। সবশেষে দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান তার নিজস্ব বিকাশের জন্য কেমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, সমাজের সামগ্রিক বিকাশের জন্যই বা কেমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। ওয়েল্‌স্‌-এর 'ভিত্তিহীন আশাবাদ' বা হাক্সলির

(ব্রেভ নিউওয়ার্ল্ড) ভাবনা, কারও প্রতিই তিনি পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। উভয় ভাবনাকেই বিশ্লেষণ করেছেন। রাসেলের ('ইকারাস' বা 'প্রসপেক্টস অফ ইনডাস্ট্রিয়াল রিভুলিউশন') নৈরাশ্যবাদী ভাবনাকে মর্যাদার সঙ্গে আলোচনায় এনেছেন।

জিন্‌স্ ও এডিংটন যে আদর্শবাদী ধারণার প্রবর্তন করতে চাইছেন তার বিপদজনক দিকসমূহ বইটিতে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বার্নাল নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেননি। যা অনেক লেখকের বেলাতেই সচরাচর দেখা যায়।

ভারতের বিজ্ঞান বিষয়ে বার্নাল যা আলোচনা করেছেন তার কথা না বলে পারা যায় না। 'নেচার' এর মত বিখ্যাত জার্নালেও যখন শিক্ষা ও প্রশাসনে শ্বেতকায় মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবি করা হয়, বার্নালের মত একজন রয়েছেন, যিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এই মত খন্ডন করেছেন। ভারতীয় উপনিবেশে শ্বেতকায় মানুষের এমন অনুপ্রবেশের তত্ত্ব বার্নালের মনঃপূত হয়নি। বইয়ের (২০৭-৮) পৃষ্ঠায় তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আশা করব, তৃতীয় বন্ধনীতে আমি যা লিখেছি তা 'অনধিকারীর বুদ্ধিচর্চা' বলে অবজ্ঞা করবেন না। রামানুজনের গণিতচর্চা, বসুর পদার্থবিজ্ঞানচর্চা (শারীরবিদ্যা বললে ভাল হত কেন না বসু অনেক আগেই পদার্থবিদ্যার গবেষণা ছেড়ে দিয়েছেন) এবং রমন দেখিয়েছেন, ভারতীয় বিজ্ঞান কেমন উচ্চতায় যেতে পারে। ভারতীয় বিজ্ঞানকে কেমন অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয়, বড় আকারের উন্নয়ন কেন সম্ভব হচ্ছে না, কেন বিজ্ঞান চর্চা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বড়মাত্রায় প্রভাব তৈরি করতে পারছে না, বার্নাল তার যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই ভারতীয়দের নিজেদের অন্তরে বিজ্ঞানের তাগিদ অনুভব করতে হবে। কিন্তু প্রায় সময়েই এ বিষয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখা যায়। ভারতীয় হলেই যেন ইংরেজ প্রণালী পেরিয়ে এসে তাকে বিজ্ঞান শিখতে হবে। ইংরেজদের নিরন্তর গঞ্জনা ও উপেক্ষার মধ্য দিয়ে কাজ করে যেতে হবে। এর প্রতিক্রিয়া দুরকমের। বশংবদ একটা শ্রেণি তৈরি হয়। উদ্ধত একটা শ্রেণি তৈরি হয়। উভয়েই বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে ক্ষতিকর। একাধিক মৌলিকসূত্র ও পরীক্ষা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সম্পাদন করেছেন যা প্রশংসিত হবার যোগ্যতা রাখে। শুধুমাত্র দেখাশোনার অভাবে ও প্রশাসনিক গাফিলতিতে সেসব কাজ পুনরায়

বিকশিত হতে পারছে না। এক হাজার বছর আগে আরবের পণ্ডিত ও পরিব্রাজক আলবেরুনি ভারতীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে যা বলে গিয়েছেন, আমরা তার সঙ্গে সহমত পোষণ করি। ভারতীয় বিজ্ঞানকে তিনি গোবর ও মুক্তোর মিশ্রণের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চাকে জনৈক বিদেশি কেমন চোখে দেখছেন, এটি তার এক বড় উদাহরণ। 'বলার অপেক্ষা রাখে না, ইংরেজ সিভিল সার্ভিস ও সেনাদলের পরিতোষ ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রে যেমন এদেশে অর্থের অভাব ঘটে, বিজ্ঞানের বেলাতেও তাই (তিনি সঙ্গে ভারতের জাতীয়....* তুলনা করতে পারতেন)।' ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মোট বরাদ্দ আড়াই লক্ষ পাউন্ডের বেশি কখনও হয় না। এর সিংহভাগ টাকা আবার সম্পূর্ণ অকর্মণ্য একদল মানুষের বেতন হিসাবে ব্যয় হয়। হিসাব করলে দেখা যায়, মাথা পিছু বিজ্ঞান চর্চার বরাদ্দ দেড় পেনির মতন। অথবা জাতীয় আয়ের (১,৭০০,০০০,০০০ পাউন্ড) মাত্র শতকরা ০.০১৫ ভাগ। অথচ ভারতে বিজ্ঞানের যে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান কিশের সম্ভাবনা বাড়াতে চাইলে, এদের সবার আগে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। *সম্ভবত ভারতীয় বিজ্ঞানে এখন বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান উন্নয়নের প্রধান প্রতিনিধি নন, যে রাজনীতির লোকজন আন্দোলন পরিচালনা করছেন তারা মুখ্য প্রতিনিধির পরিচয় লাভ করেছেন। (Italics লেখকের)*

বইটি বিষয়ে এতসব প্রশংসার পরেও দুএকটি কথা বলার রয়েছে। হয়তো লেখক স্থানাভাবে যোগ করতে পারেননি। এই সময়ে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েকটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হচ্ছে। এই কাজ যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা বিজ্ঞান বিষয়ে কিছুই জানেন না। যে ইংরেজরা নিজের দেশে কাজ জোগাড় করতে পারেন না, সেই তৃতীয় শ্রেণির লোকজন দিয়ে ওই জায়গাগুলো এদেশে পূরণ করা হচ্ছে। শিক্ষার পদাধিকারী হিসাবে বসিয়ে মোটা টাকার মাইনে দেওয়া হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের এ কোন পথ নয়। যে মানুষগুলো এখন শীর্ষপদ দখল করে আছেন, তাঁদের গবেষণার বিন্দুমাত্র সামর্থ নেই। তোষামোদ, কাদা মাখামাখি বা রাজনীতির নোংরামো কাজে লাগিয়ে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে ওরা জায়গা করে নিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রের মত শিক্ষার বেলায়ও আমলাদের হাতেই এখন শিক্ষার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যারা পরিচালনা করেন তাদের সেখানে থাকার কথা ছিল না। ছাত্রদের সামান্য মাইনে থেকে যে টাকা রোজগার

হয় তা দিয়ে সরকারি স্কুলগুলি চালাতে হয়। ফলে ভারতীয় 'অধ্যাপকবৃন্দ' পরজীবী আধিকারিকদের তালিকায় অন্যতম পরজীবীর ভূমিকাই পালন করছেন। রাজনীতির প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাকে যেমন খুশি অপমান করলেও ব্যথিত হন না। কিছু ছাত্রকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পংক্তিতে তিনি জায়গা করে দিতে পারছেন বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। গবেষণা ওইসব মানুষদের কাছে দুর্বোধ্য শব্দ। (.....*)। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে যে ধরনের বিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে, বইটি পড়লে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সমাজের গঠন যেমনই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যেমন খুশি অগ্রগতিই ঘটুক না কেন, ১৯৩৯ সালে লেখা একজন উঁচুমানের বিজ্ঞানীর এই বই বিজ্ঞানের অবদান ও প্রত্যাশাকে আমাদের কাছে সকল সময়েই পৌঁছে দিতে সমর্থ হবে।

(* অস্পষ্ট)

# কন্যা মীরা কোসাম্বি

প্রথম কন্যার নাম মায়া কোসাম্বি। স্থাপত্যবিদ জয় সরকারকে বিয়ে করেন। সুইডেনে থাকতেন। ক্যান্সারে মারা যান। ব্যাডমিন্টন খেলার সূত্রে দুজনের পরিচয় ও পরে বিয়ে হয়েছিল।

ডি. ডি. কোসাম্বি ও নলিনী কোসাম্বির দ্বিতীয়া কন্যার নাম মীরা। তিনি ১৯৩৯ সালের চব্বিশে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাইয়ে থাকেন। বয়স সত্তর ছুঁয়েছে। নিজেকে তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সমাজতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। SNDT মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 'নারীচর্চা কেন্দ্র' রয়েছে সেখানে তিনি প্রায় এক দশক অধিকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছিলেন নারী আন্দোলনের সুবিখ্যাত চরিত্র পণ্ডিতা রামাবাঈ। তাঁর যাবতীয় রচনা সংগ্রহ সুসম্পাদিত আকারে প্রকাশ করেছেন মীরা কোসাম্বি। মূল মারাঠি থেকে পরম যত্নে বৃহত্তর পাঠক সমাজের জন্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

মীবা কোসাম্বি

তাঁর রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের তালিকাটি আমরা নীচে যোগ করছি। পিতার সুযোগ্যা কন্যা তিনি। বইয়ের তালিকাটিই সেই সাক্ষ্যে বহন করে।

1986 Bombay in Transition : The Growth and Social Ecology of a Colonial City, 1880-1980, Stockholm, Sweden : Almqvist & Wiksell International

1994 *Women's Oppression in the Public Gaze : an Analysis of Newspaper Coverage, State Action and Activist Response* (edited), Bombay : Research Centre for Women's Studies,

S.N.D.T. Women's University

1994 *Urbanization and Urban Development in India,* New Delhi : Indian Council of Social Science Research

1995 *Pandit Ramabai's Feminist and Christian Conversions : Focus on Stree Dharma-neeti,* Bombay : Research Centre for women's Studies, S.N.D.T. Women's University

1996 *Women in Decision-Making in the Private Sector in India* (with Divya Pandey and Veena Poonacha), Mumbai : Research Centre for Women's Studies, S.N.D.T. Women's University

2000 *Intersections : Socio-Cultural Trends in Maharashtra* (Edited), New Delhi : Orient Longman, New Delhi

2000 *Pandit Ramabai Through Her Own Words : Selected Works* (translated, edited and compiled) New Delhi ; New York : Oxford University Press

2003 *Pandita Ramabai's American Encounter : The Peoples of the United States (1889)* (translated and edited), Bloomington : Indiana University Press.

2007 *Crossing Thresholds : Feminist Essays in Socail History, Ranikhet : Permanent Black*

## *নির্বাচিত রচনা - ১*

*২৫ শে জুলাই ১৯৬০। পুনে শহরের রোটারি ক্লাবের আমন্ত্রণে অধ্যাপক কোসাম্বি আমাদের দেশে পরমাণু শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণে যেমন পরমাণু বিজ্ঞানের কথা রয়েছে, ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে কী ধরনের শক্তি উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেই প্রস্তাবনাও রয়েছে।*

*গত কয়েকবছর ধরে আলোচিত ভারত মার্কিন পরমাণু চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই বক্তৃতা এক স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে। রচনার শৈলী তাঁর অত্যন্ত নিপুণ। আমরা তাই এর লিখিত রূপের কোনো ভাষান্তর করিনি।*

# Atomic Energy for India

The Word energy is associated in the minds of most of you with steam engines, electric supply, diesel or petrol motors, water-turbines and perhaps windmills. The word evokes others like horsepower, kilowatts, and calories ; perhaps also electricity and petrol bills, price per ton of coal, and increased taxes for the five-year Plans. I want only to point out to you that these technical, social and economic considerations go very deep, down to the foundations of human society. With the coming of atomic energy, they have reached a stage, which is critical for the whole of mankind, far above mere personal considerations.

We rarely think of the simplest and most familiar type of energy, namely that derived from food – though far too many in this world still have to think of food as the one overwhelming need for their lives. Man needs from 2000 to 4000 calories of nutritional energy per day, according to the climate, conditions of work, and type if food taken. In our ordinary discussions of a balanced diet vitamin etc. this elementary fact is often forgotten ; namely that the value of food depends upon the

amount of energy it can release in the human or animal body. To make this energy available in the degestive system, man needs to have his food cooked by fire, which means another form of energy obtained by burning fuel. The history of mankind begins with the first steps above the animal stage, when man learned to control fire, and began to produce food instead of just gathering it.

The next step, the formation of human society proper, with division of labour and differentitation of social functions, was made possible only by more power : that of animals such as cattle or horses for agriculture and transport. Human labour-power was also used in greater quantity, whether slave labour or that of paid drudges. Other sources such as windmills and water wheels helped. The industrial revolution could not have been realised before the discovery and the extensive use of the steam engine, in the early 19th century. Man succeeded in the conversion of fire-energy into mechanical work. Electricity came later in that century. It could be generated with or without the steam engine, as for example waterpower or the windmill ; its chief advantage lay in the transmission of energy to places distant from the point of generation. The steam engine used directly meant chains, driving rods, gears, cables, or some such mechanical transmission. You know how much human society has been changed by electricity in a single lifetime, say the life-time of Edison.

What is the ultimate source of all such power? Food-grains, fruit, nuts etc. store their energy from sunlight, which is absorbed by the living plant, along with carbon dioxide from the atmosphere, water vapour and other substances. Cellulose thus made is also the main source of the energy stored in firewood. Coal and oil are simply organic matter converted by deep burial in the earth for millions of years. Hence, all these forms of energy come from the sun, the diffeence being in the

method by which the energy is stored. The chemical processes involved may be described as molecular change. The breakdown of the energy in food and fuel is also chemical and molecular. The molecules may change, their atoms do not. For wind-power, the sun heats up some of the air, which rises, and is replaced by other, cooler air. These air-currents drive the windmill. Waterpower is similarly drawn from the sun without chemical change. The water evaporated by the sun's heat rises, forms clouds, and comes down again as rain. What we utilise is the how of rainwater from a higher to a lower level.

The electric energy, which appears on out monthly bills (in the few Indian homes fortunate eneough to have the supply) is measured in kilowatt-hours. One-kilowatt hour is equivalent to one horsepower for about an hour and twenty minutes. It is also equivalent to a little more than 860,000 calories of heat. But these are the equivalents when nothing is lost in the change from one form to the other. In practice, something is always lost. No trnsformation of energy is a hundred percent efficient, and most of them are decidedly inefficient. The machine loses a good deal of energy in friction ; electricity is lost in transmission, and by leakage ; heat is radiated away. these losses are physically inevitable, and a fundamental property of matter. but energy is also a fundamental property of matter, apart from the chemical changes and mechanical processes. Matter cannot be destroyed by ordinary mechanical or chemical process. But if it could be annihilated in some way, an equivalent amount of energy must appear. This was finally proved by Einstein, who summed it up in the formula $E=mc^2$ which gives the absolute energy available from a given amount of matter.

Atomic energy is fundamentally different from molecular energy. For the first time in history, man has been able to duplicate the solar processes for himself on earth. Solar energy depends upon the breakdown of the atomic nucleus, with the

resultant emission of heat, x-ray radiation, longer electric waves, and particles such as electrons, neutrons and the like. These last correspond to the smoke and ashes or ordinary fuel, but are much more dangerous to man. The electricity cannot be utilised directly. The main useful output of atomic nuclear reactions is still the heat, which has then to be converted into power like any other source of best. This might seem wasteful, but is much less wasteful than other forms of conversion. the animals, including man, cannot convert more than a limited amount of food per individual into energy, and that too not without considerable waste. Not only is the animal power plant quite inefficient, but it has to be stoked and fed all the time, whether any energy is utilised or not. You all know the low efficiency of coal and oil fuel. Hydro-electricity is better, but limited by lack of flexibility, and restriction to certain favourable localities.

What can humanity do with atomic energy? We must distinguish between what is now technically possible and what might theoretically be achieved in the very distant future. The most that has actually been done is to break down uranium nuclei, and to use the energy liberated. Other atomic nuclei can be broken down, but generally the process eats up more energy than it liberates. You know that this process has been misused. The atomic age arrived with a bang at Hiroshima and Nagasaki, in the form of a most deadly bomb. Its main use since then has been as a military and political weapon in the cold war, with which ceratin powers have tried to cow their opponents. The sun gets most of its energy from fusion. Four nuclei of hydrogen are squeezed together under immense heat and pressure to form one of Helium. A certain amount of mass left over in the process is converted directly into energy, by Einstein's Law. This has been done on earth in the hydrogen bomb. No materials known on earth can withstand the temperatures of fusion energy. If the available uranium were properly shared, we could convert

many deserts into veritable gardens, industrialise the densest Amazon jungles, and free mankind from the worst forms of drudgery. This is no longer a technical problem, but a social one. A few pounds (about 8) of uranium sufficed to run a great submarine for seventy days. Automatic power plants could in theory be built which could be refuelled by air once every few months. Half a dozen trained men could run them. these plants could be located in any part of the world, without railways, waterways, or even road communication. But is the world prepared for this? The main question that most of you will ask is : What is the investment value of atomic energy? If the preliminary research and refining is to be done, there is virtually no investment value, for the private sector. The whole affair is fantastically costly. Those who say that atomic energy can compete with thermal or hydro-power, carefully omit to mention the fact that the preliminary costs have always been written off to someone else's account usually that of some government. Only in some socialist countries, where uranium is relatively plentiful, and new lands have to be opened up, is it possible to utilise atomic energy properly. Even there, military considerations play a considerable part, because of the cold war.

It is true that the known resources of radioactive material in the world exceed those known for coal. But the cost of uranium is artificially high. Then there is also the question of by-products. Animal by-products are good fertilisers ; the skins and meat can also be used. For human beings, the by-products are taken care of by a good sewage system and the dead bodies by funerals. In industrial countries, the average temperature over cities (e.g. London) goes up by a couple of degrees Fahrenheit, due to the use of coal. There is also the smoke, acid deposits that corrode buildings, carbon monoxide poisoning of the air by petrol fumes, and smog. These are trifling in

comparison with the waste products of atomic power plants. The pile has to be very heavily shielded to screen harmful radiation. No one knows where to put the radioactive wastes from uranium piles. Every possible mine or pit is being rapidly filled up in the USA ; the sea is unsafe, the rivers even more so. This is best brought out by the effects of atom-bomb tests. The fallout is found all over the world. The Bikini tests made grass in California radioactive and poisoned fish that would otherwise have fed Japanese a few thousand miles away. Excessive doses of radioactivity always come serious changes in all living organisms. Some of these changes lie in the mechanism that enables the organism to breed. Most of these hereditary changes are lethal ; that is, they kill the organisms born in the next generation. The Japanese have followed up persons exposed to atomic radiation at Hiroshima. Many of the children born to women who have been so exposed can hardly be called human ; but they do not live to grow up. The real danger lies in the minute genetic change that does not show itself for some generations. It is known from experiments on smaller animals that these changes, when fully developed, may lead to incurable mental derangement within a few generations. By the time we know what the effect on mankind is going to be, it will be far too late to do anything about it. The changes will have been bred into millions of human beings of that generation and remain thereafter. This is not a disease, or an infection that I am talking about, but hereditary insanity, physical degeneracy, and worse. The only cure is to stop all atomic tests immediately, and to take great care that the waste pro-ducts of atomic power stations for peaceful purposes will be safely isolated. The advanced countries have quietly reduced their atomic power programs. The prestige of having atomic power stations does not compensate the extra expenditure of the extra danger involved.

Where does that leave us in India? We do need every available source of power quickly. Can we utilise atomic power for national progress? This question has already been answered in the affirmative by the high command. The papers inform us that another hundred crores or more are to be devoted to this purpose beyond undisclosed millions already spent. It was announced in August 1956 that India had joined the ranks of the atomic-energy producing countries. Actually, we were not then producing any atomic power. Though a second reactor costing another ten crores of rupees has gone into operation, and the staff has reached over two thousand highly trained graduates, we still, produce no utilisable atomic power. The setting up of atomic power stations in other countries is now quite easy. Even China has one giving 7000 kilowatts since last year, and may build more. The USA, UK, USSR, France, Canada and some other countries could build one or more for us–if we are willing to pay the cost. The question is whether this cost is worthwhile.

I do not propose to answer this question, because all of you here are intelligent to work out the answer for yourselves. But I do wish to point out that the main work in producing atomic energy has already been done without coat to India by a permanent source, which has only to be utilised properly. This generous source is the sun, which goes on pouring its blasting rays into every tropical country, at an uncomfortable rate. Can solar energy be used directly?

The answer is yes. The USA, Russia or England, for example do not receive so much direct solar radiation as India. There is no reason why we should ape them in all things, including the development of atomic energy at a fantastic cost with low-grade Indian uranium. On an average day, every hundred square metres (1100 square feet) of area will receive about 600-kilowatt hours of heat. This comes to over 160 pounds of high-grade

coal, or more that 16 gallons of petrol, in energy equivalent. If it could all be utilised at 100% efficiency, we could evaporate some 240 gallons of water per day. At present, the best known efficiency of utilisation is by solar batteries, which are between 11% and 15% efficient. The Americans are already using such batteries to boost telephone currents in long-distnce lines. If I could use such batteries on my own bungalow roof, it means 7 kilowatts for every hour of average sunshine, say 60-kilowatt hours per day. This would give my family enough power for all cooking, lights, hot water gadgets, (vacum cleaner, fridge) air-conditioning, and still leave enough for an electric automobile run on storage batteries. The Russians produce enough steam power from solar energy to supply all the needs of a modern town of over 15,000 inhabitants in the southern USSR. Even as early as 1876, a 2.5-horsepower steam pump was run on solar heat in Bombay. A striking instance of the immense reach of solar power comes from the space-satellites, which send their information to earth by radio transmitters that run on solar batteries. The best of them continued to communicate with our globe from well over 20 million miles away.

It seems to me that research on the utilisation of solar radiation, where the fuel costs nothing at all, would be of immense benefit to India, whether or not atomic energy is used. But by research is not meant the writing of a few papers, sending favoured delegates to international conferences and pocketing of considerable research grants by those who can persuade complaisant politicians to sanction crores of the taxpayers' money. Our research has to be translated into use. The catch in solar energy is its storage. The current you may want at night can be produced irregularly in the daytime. This in not an insoluble difficulty. Quite efficient forms of storage batteries are known. it is possible to combine several uses with mechanical storage. For example, water could be pumped up

into 50-foot village towers village towers during sunlight hours, and then allowed to run our for irrigation, or home use, through low-pressure turbines that generate electricity whenever wanted. This is not very efficient at the second stage, but the main purpose of augmenting our poor water supply will have been efficently served, village-by-village.

The most important advantage of solar energy would be decentralisation. Te electrify India with a complete national grid would be difficult, considering our peculiar distribution of hydropower and thermal resources. With solar energy, you can supply power locally, with or without a grid. Solar power would be the best available source of energy for dispersed small industry and local use in India. If you really mean to have socialism in any form, without the stifling effects of bureaucracy and heavy initial investment, there is no other source so efficient. Take the simple problem of reforestation, which alone one change India's agriculture, preserve her rapidly eroding soil, and increase production. This problem is insoluble unless people have cheap fuel for cooking, so that they need not cut down trees. The solar cooker if it worked, would have been the answer. We know that the cooker produced some years ago with such fanfares and self-congratulations is useless. Even a schoolboy should have known that the pot at the focus of the solar cooker, being nickelled and polished, would reflect away most of the heat. But our foremost physicists and research workers, who rushed to claim personal credit and publicity, did not realise this. That is the result of paper research and research for advertisement. If we get over this fundamental hurdle, we have the real cost-free source of atomic power, the sun, at our disposal, for more that eight months of the year.

Solar energy is not something that any villager can convert for use with his own unaided efforts, at a negligible personal expenditure, *charkha* style. It means good science and first-rate

technology whose results must be made available to the individual user. The solar water heater is the simplest to manufacture a black absorbing grid like an automobile radiator, and an insulated storage-tank. No moving parts are involved. The water can be delivered much hotter than needed for a bath, but below the boiling point. Such heaters are already used successfully in Israel and elsewhere, and would save a great deal of fuel by themselves in the Indian household. For the steam engine, it is necessary to concentrate the sun's rays, usually by a light silvered concave re-hector which moves with the sun. These are also quite practicable, and in use. Direct conversion of sunlight into electricity is familiar to many of us as the photoelectric cell, and the photometer used for correct exposure. These are very simple and efficient to use, but cost more money to make. The technique has now been simplified and the cost reduced by careful study of semi-conductors. The most effective solar battery of which I have any knoledge is based upon silicon-zinc crystals. Their production, too, is commercially sussessful, but needs still more research–which continues uninterrupted in other countries. The Chinese use semi-conductors directly to produce enough electricity even from the waste heat of an ordinary kerosent lamp to run a radio set ; their appliances are on the international market now. What India could use best in this way still remains to be determined. The principle involved in the use of atomic energy produced by the sun as against that from atomic piles is parallel to that between small and large dams for irrigation. The large dam is very impressive to look at, but its construction and use mean heavy expenditure in one locality, and bureaucratic administration. The small bunding operation can be done with local labour, stops erosion of the soil, and can be fitted into any corner of the county where there is some rainfall. It solves two fundamental problems : How to keep the rain-water from flowing off rapidly into the sea, unusede ; and how to encourage local

initiative while giving direct economic gain to the small producer. The great dams certainly have their uses, but no planners should neglect proper emphasis upon effective construction of the dispersed small dams. What is involved is not merely agriculture and manufacture, but a direct road to socialism.

Every notable advance in man's control over new sources of energy has been hampered by outworn superstition or obsolete social forms. Fire is regarded today as a convenient tool in the service of humanity. Primitive man thought it necessary to worship fire as a god. *Agni* received human and animal sacrifice; vestal virgins might be dedicated to his service. Is it less miserable a superstition that calls for the sacrifice of millions of men and animals, living or as yet unborn, to atomic tests and radio-active fallout? It seemed inevitable to Victorian England that dreadful industrial slums should accompany the first large scale use of the steam engine ; it also seemed necessary to conquer many colonies for supply of raw materials and as market for the finished goods of the factories that the steam engine first made possible. We claim to know better now. If so, has the time not come to change society so that the new discoveries will serve the needs of all mankind rather than the perverted greed of the few? Then, and only then, it will be possible to determine how much effort be spent relatively on the development of the various energy sources.

*নির্বাচিত রচনা - ২*

*বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে অধ্যাপক কোসাম্বির মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল। দুজনে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের যে সাক্ষাৎকার, তার লিপিবদ্ধ বিবরণী আমরা পাই। যদি আইনস্টাইন-কোসাম্বি কথোপকথন লিপিবদ্ধ থাকত, দুজন মানুষের প্রতিই হয়তো আমরা নতুনতর আলো ফেলতে পারতাম।*

*আইনস্টাইন বিষয়ক রচনাটি আমরা এখানে যোগ করেছি এই অভিপ্রায়ে, আধুনিক সভ্যতার শীর্ষ এক বিজ্ঞানীর কাজ ও ব্যক্তিত্বকে কোসাম্বি কেমন চোখে দেখতেন বুঝতে পারব।*

## Einstein
## The Passionate Adventurer

'That's our Professor Einstein', said the American taxi-driver with tenderness and pride rare in his notoriously disrespectful clan. The recipient of this accolade was clumping vigorously along the Princeton sidewalk one gloomy December afternoon in 1948. The famous mane of hair, now white and thinner, was still unprotected by a hat. Shirt and necktie had been replaced by a sailor's knit jersey, socks dispensed with altogether.

This was an unforgettable first glimpse or the man whose theories had evoked the complete spectrum of comment from derision to adulation. The simplicity of his dress was matched by his bearing at all times, even in scientific discussion. His life, however, had not been as tranquil as his aspect. This pioneer citizen of a new universe had to change his earthly citizenship several times. Germany, the country of his birth and education, denied him full effectiveness because he was Jew.

Zionism, which he tried so hard to serve, did not gain because he took the advice of people without vision. His personal judgment of scientific merit came to be regarded as worthless, for anyone could prey upon his .bundant kindness to obtain a superlative testimonial.

Popularly labeled the world's greatest to the really great mathematicians and greatest mathematician, of his day such as Dedekind, Poincaire, Hilbert. The imputation that he was the father of the atom bomb led him to say bitterly towards the end of his lift that if it were to do over again, he would prefer to be a plumber or a tramp rather than a scientist. He did write the letter that let president Roosevelt to allocate funds for the immediate development of nuclear chain reactions. Not he but other Princeton colleagues brought their talents to bear upon the technical development of the A-Bomb and the H-Bomb, heedless of the disaster to humanity. It is stated that it is his equation $E = mc^2$ led inevitably to atomic warfare. This is true to about the same extent that the Sermon on the Mount led inevitably to the sack of Constantinople in the Fourth Crusade.

Einstein's great achievement was a completely new way of looking at the material universe. The amount of matter in space at any time affects the properties of space itself, and also the measurement of time. Other radically new scientific ideas that characterize the first half our century crystallized rapidly about the theory of relativity.

The fine mechanical system developed by Newton and his successors had begun to show small but clear and unmistakable flaws by the end of the 19th century. The planet Mercury did not move with the proper clockwork accuracy. Both electricity and magnetism obeyed Newton's inverse square law, just like graviation; but what was the connection between them and gravity? Ultimate particles of matter carried electro-magnetic

charges. Why did they send out electromagnetic waves-light as gravitation did not? Why was the velocity or that light completely unaffected by the earth's rapid movement through space? If mass and energy wer indestructible, how did the Curies' new element Radium constantly shoot off particles as well as the x-rays discovered by Roentgen? Man's search for new sources of power and energy was being blocked by outworn notions of matter.

Einstein helped solve more that one or these problems, but his main work developed out of the question : why does light travel with a speed independent of its source? He turned the question about, and said that the constant velocity of light is a fundamental property of empty space. Two observers at a distance could compare their watches and yardsticks only by flashing light signals whose velocity remained the same for both, no matter how they moved. This leads to entirely new concepts of measurement and simultaneity. It also relates mass and energy, which become two interchangeable aspects of the same thing.

Philosophers and theologians dragged in the Bible, Karl Marx, and immortality of not yet forgotten. He alone saw beyond mere verbal controversy. Some new, powerful tool was needed for the analysis of time and space. Not only had all major known facts to be explained, but it was essential to predict phenomena not as yet observed. This tool was discovered by him in the work or two Italian mathematicians, Ricci and Levi-Civita. Its use had to be mastered painfully. Then came the "passionate adventure into the unknown" upon which he looked back as filling the finest years of his life : the precise mathematical formulation of the unity or space, time, and matter. The sublime exaltation of such discovery has to be experienced. It cannot be explained to those who seek it in mescaline, or the

ascent of impassible mountain peaks. He took good care to associate competent mathematicians with his work. The insight, however, was his alone. So many of us produced beautiful and intricate formulae without knowing what to do with them, while he thought his way slowly to Nature's secrets.

The first magnificent result was published during the early years of that senseless slaughter, the First World War. The new theory explained not only Newton's gravitational law, but also the curious behaviour of Mercury. There was a spectacular prediction, that a ray or, light passing close to the sun would be bent slightly. As light has no mass, Newton's theory could not explain this ; even if the rays did have weight, the deflection by Newton's theory would be only half that given by Einstein. Special observations made during solar eclipses confirmed the Einstein law. The theory passed thereafter as current coin into the common treasury of man's knowledge.

It was not in astronomy but in the opposite direction that the influence of relativity was indispensable. What happened inside the atom received a better explanation. Einstein went on to combine gravitation with electro-magnetism in a succession of theories, over the years 1929-1949. When it appeared that virtually no solutions existed of his final equations, he had the courage to face possible ruin of twenty years' hard work : "Perhaps, my dear colleague, Nature does not obey differential equations after all". The solutions were found later by Hlavaty. However, Nature still has the Last word. The inexhaustible properties of matter continually revealed by experiments in nuclear physics have outsripped all theories.

It seems to me that we now stand close to the threshold or a new life, as far above any pre-atomic utopia as that was above the early Stone Age. If we really cross the threshold into a new age, it will be by renouncing war and greed for individual

profit. Then indeed may our descendants abandon this little cinder of a planet for really brave new worlds in unbounded space. Busy with the creation of real history, they might no longer be conscious of their historical past. But one of the individuals who led us nearer to the threshold was the passionate adventurer-Einstein.

# নন্দীর পিঠে কুঁজ

*যতদূর জানা যায়, ছোটদের জন্য তিনি কলম ধরেছেন একবারই। এই একটিমাত্র ছোট গল্প লিখেছেন। ইতিহাসের গল্প। বিজ্ঞানের গল্পও বলা যায়। যাই বলি না কেন, গল্পটি যে খুব উঁচুমানের, এ নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। তিনি গল্পটি লন্ডনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। এই গল্প কোন বইয়ে আজও সংকলিত হয়নি। ফলে অনেকের কাছেই লেখাটি অপরিচিত থেকে গিয়েছে।*

আজ গাঁয়ে বাৎসরিক পশু উৎসব। গাঁয়ের প্রধানের ছেলে রাম। তার আদরের ষাঁড় নন্দীকে সে জঙ্গলে ঘাস খাওয়াতে এনেছে। সন্ধেবেলা গাঁয়ের সকল পশুদের নিয়ে মিছিল হবে। জঙ্গলের ধারে একটা পুকুর। পুকুর ধারে সিদ্ধিগাছের তলায় গাঁয়ের দেবতার অধিষ্ঠান। জঙ্গল থেকে বন্ধুরা সব এক এক করে আসবে। আলোচনা হবে জমিয়ে, ভারতীয় গরুদের পিঠে কুঁজ থাকে কেন?

রাম : নন্দী! তুমি বলতে পার, শুধু গরুদের পিঠে কুঁজ থাকে কেন? মোষটাকে দেখ। ঘোড়াদের দেখ। পিঠ এদের একদম সমান।

রামের কুকুর মোতি। মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল। কোত্থেকে এল যেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ভৌ ভৌ, আমি যখন বেড়ালদের তাড়া করি, ওরা ধনুকের মতো বেঁকে যায় কেমন, দেখেছ কি? নন্দীর পিঠে তেমন কিছু হয়, আমি চোখ বুজে বলতে পারি। কোন কিছু থেকে সে ভয় পেয়ে যায়।'

মতি আর নন্দী জল খেতে চলে গেল।

'ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ, ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ—হেঁড়ে গলায় ডাকতে ডাকতে ব্যাঙ জল থেকে লাফিয়ে উঠল, — 'নন্দী ভয় পায় কীসে! দিন কয় আগে তো বাঘেরাও তাড়া করে তাকে ধরতে পারেনি। দেখ, আমি কেমন ফুলছি। আমার মতো নন্দীর কুঁজও বাতাস দিয়ে ভর্তি, আমি না ভেবেই বলতে পারি।'

সিদ্ধিগাছের গর্তে একটা বুড়ো কেউটে সাপ ছিল। বুকে ভর দিয়ে হিস হিস আওয়াজ করে বেরিয়ে এল। বলল, 'বাতাসে বুক ফোলে, কারও পিঠ ফোলে না।

একবার আমি একটা ধেড়ে ইঁদুর গিলে এক হপ্তা ঘুমিয়েছিলাম। আমার শরীরের মাঝখানটা বড্ড ফুলে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত, নন্দী কিছু বড় জিনিস গিলে ফেলেছে।'

নন্দী! তুমি বলতে পার, শুধু গরুদের পিঠে কুঁজ থাকে কেন?

'হো হো হো' গর্জন করতে করতে ভালুক বন থেকে বেরোল।

'নন্দীকে কেউ হুল ফুটিয়েছে। তোমরা ভাবছ সে বুঝি একটা বড় লাউ গিলে ফেলেছে। তাই ভাবছ তো? গত বছর আমি একটা মৌচাকে মধু চুরি করতে গিয়েছিলাম। যত মৌমাছি ছিল, মনের সুখে আমাকে কামড়াল। মুখের একটা দিক আমার কী যে ফুলে গিয়েছিল! মা-তেই হবে, নন্দীকে কেউ হুল ফুটিয়েছে।'

বানর হুপ করে লাফ দিয়ে সিদ্ধি গাছ থেকে নামল। 'হুপ হুপ হুপ। দেখ, এই গাছের ফল খেয়ে আমার চোয়ালের থলেগুলো কেমন ফুলে উঠেছে। মাঠে ঘাস খেতে গিয়ে নন্দী কিছু ঘাস মুখের থলেতে জমিয়ে রেখেছিল। ওই ঘাস যদি কুঁজ-এ না থাকে তবে সে জাবর কাটবে কেমন করে? দেখ তোমরা, সে কেমন জাবর কাটছে।'

'লোভী বাঁদরের মতোই কথা বলছ'—রাম বলল, 'ওই কুঁজ দেখতে তো বরাবর একই রকম। তোমার ফল খাওয়া শেষ হলে চোয়াল ফুলে থাকে। নন্দীর কুঁজ তবে মিলিয়ে যায় কেন?'

নন্দীর দিকে তাকিয়ে রাম বলল, 'তোমার কুঁজের কথা তুমি নিজেই বল।'

নন্দী বলল, 'একসময় মনে করতাম, সব রকম গরুর শিং আছে। সব রকম গরুর কুঁজও আছে। গতকাল জেলার একজিবিশনে যোগ দিয়ে আমি প্রথম হয়েছি। ওখানে কয়েকটি ইয়োরোপের গরু ছিল। দেখতে কী মজার! ওরা নিজেদের ভেতর কী যেন বিড়বিড় করে বলছিল। আমার তো মজা লাগছেই। শিং নেই কোন, পিঠটা অদ্ভুত, একেবারে সমান। ওরা তখন বলছিল কি জান? বড় কুঁজওয়ালা এরকমটা ষাঁড়কে প্রথম পুরস্কার দিল! আমার মনে হয়, তোমরা মানুষেরাই ওদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছ। এখানে তো আমরা কুঁজ আছে বলে জোয়াল টানতে পারি ভাল। ভাল গাড়ি টানতে পারি। লাঙল বইতে পারি ভাল। ওই গরুগুলো আমাকে বলল, তাদের দেশে ঘোড়া দিয়ে কাজ চলে। শুনি, এখন তো আবার যন্ত্র দিয়ে কাজ হয়।'

রাম কথাটা মানতে চাইল না। সে বলল, 'বইয়ে লেখা আছে নন্দী শিবের বাহন। আরামে হেলান দিয়ে বসবেন বলে শিব নন্দীর পিঠে কুঁজ তৈরি করেছেন। ছবিটা দেখ, তিনি কি আমার উপরে বসে আছেন? আমাদের গাঁয়ের দেবতা তো এই সিদ্ধিগাছেই থাকেন। চল না, তাঁকে গিয়েই জিজ্ঞেস করি, নন্দীর পিঠে কুঁজ হল কেন?'

কতকালের পুরনো সিদ্ধিগাছ সব শুনে বলল, 'নন্দী ঠিক কথাই বলেছে। মানুষ তার পছন্দ মতো সব তৈরি করেছে। মোতির মতো কুকুর তৈরি করেছে। চাল ও গম তৈরি করেছে। মানুষ নিজেরা যেমন দেখতে, সেও তো ওদের নিজেদেরই তৈরি।'

রাম : 'তা কী করে হয়? গত বছর আমাদের নতুন বাড়িটা তৈরি হয়েছে। মানুষই তৈরি করেছে। গাছ কাটতে হয়েছে। গাছের গুঁড়ি চেরাই করে মাপমতো তক্তা তৈরি হয়েছে। এসব কাজ করতে অনেক লোক লেগেছে। পেরেক পুঁতে ফ্রেম তৈরি করতে হয়েছে। ঘরের ছাউনির সময় বাবাকে খড়ের আঁটি তুলে দিয়েছি। কিন্তু আমরা কীভাবে নন্দীকে তৈরি করলাম? ছোট বাছুর হয়ে সে জন্মেছিল। তখনই-ই তার পিঠে কুঁজ ছিল। এক বছর আগেও মোতি বাচ্চা ছিল। আমি অবিশ্যি একটা কাণ্ড করেছি। মা না দেখতে পেলেই আমার থালা থেকে মাঝে মাঝে মোতিকে খেতে দিয়েছি। কিন্তু আমরা তাকে কুকুর বানাইনি। বীজ থেকে শস্য হয়। চারমাস পর প্রচুর শস্য পাওয়া গেল। কেউ তো তৈরি করেনি!'

সিদ্ধিগাছ : 'রাম, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। এই ভাবেই কোন কিছু শিখতে হয়। সত্যি না জানা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে যেতে হয়। চুপ করে শোন। আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা তোমাদের বলব। কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ তোমার বানরবন্ধুদের মতোই জীবন কাটাত। গাছে চড়ে তলা থেকে মিঠে আলু রাঙা আলু তুলে আনত। ভালুকের মতো মধু সংগ্রহ করত। ভালুক যেমন থাবা দিয়ে মাছ ধরে, মাঝে মাঝে মানুষেরা তেমন করেই মাছ শিকার করত। মাংসের জন্য অন্য প্রাণীদের মেরে ফেলত। তখন আগুন ছিল না, চাষবাস ছিল না, বাড়িঘর এমনকী কুঁড়েঘরও ছিল না। গাঁ বলতে কোনকিছু ছিল না। তাই গাঁয়ের দেবতাও ছিল না। শুধু খাবার জোগাড় করে বেঁচে থেকেছে মানুষ। এখন মানুষ নিজেরাই খাবার তৈরি করে।'

রাম : 'কিন্তু এভাবে খাবার জোগাড় করতে পারলে, খাবার তৈরির কী প্রয়োজন? আমার বাবা ও দাদা মাঠে কী কঠোর পরিশ্রম করেন। এমন পরিশ্রম না করে আমরা কি বেঁচে থাকে পারি না?'

সিদ্ধিগাছ : 'সবসময়ে চাইলেই তো তুমি যথেষ্ট পরিমাণ খাবার পাবে না। মাঝে মাঝে এক একটা বছর খুব খারাপ যায়। নদীনালা শুকিয়ে যায়। মাছ থাকে না। শিকার করার মতো পশুপাখি থাকে না। ফলমূল থাকে না। অনেক মানুষ খেতে পায় না। আমার মগড়লে চড়লে এখন তুমি পাঁচটা বড় গাঁ দেখতে পাবে। অনেকদিন আগের কথা বলছি। চারপাশে সবশুদ্ধ পাঁচটা মানুষও চোখে পড়ত না।'

'আমার মত নন্দীর কুঁজও বাতাস দিয়ে ভর্তি...'

রাম : 'মেনে নিলাম। কিন্তু কীভাবে মানুষ মোতির মতো কুকুর তৈরি করেছে? কেন তৈরি করেছে?'

সিদ্ধিগাছ : শিকারের সময় মানুষ যা করে, তেমনি নেকড়েরাও শিকারের পিছু ধাওয়া করে। খেঁকশিয়াল, নেকড়ে এমনকী বাঘের মতো হিংস্র জন্তুকে মানুষ পোষ মানিয়েছে। বেশিরভাগ সময়ে হিংস্র জন্তুর বাচ্চারা ছোট থেকে বড় হলে বন্য নেকড়ের মতো হয়ে যায়। কেউ কেউ মানুষের কাছে থেকে যায়। মানুষের জন্য শিকার ধরে আনে। মানুষে এদের ছাঁট মাংস খেতে দেয়। হাড়গোড় খেতে দেয়। এভাবে একদিন পোষ মানানো নেকড়ে পেল। এরকেই তো তোমরা কুকুর বলছ।'

রাম : 'আমি খুশি, মানুষ একদিন এমন কাণ্ড করেছে। মোতিকে না পেলে আমি থাকতাম কেমন করে? কিন্তু নন্দীর পিঠে কুঁজ, সে কেমন করে হল? ওই কথা দিয়ে শুরু। এখনও উত্তরটাই দিলে না।'

সিদ্ধিগাছ : 'বন্য হরিণকে মানুষ সব সময় সামলাতে পারেনি। গরুজাতীয় পশুরাও বন্য ছিল এককালে। এরা হরিণের চেয়ে আস্তে দৌড়ায়। মানুষ এদের শিকার করে মাংস খেত। এক সময় মানুষ দেখল, কিছু বাছুরকে পোষ মানানো যেতে পারে। মোতির মতোই। আর পোষ মানানোর সময় কী হয়? কেউ তো আর রোগা লিকলিকে বাছুব বাছে না। হৃষ্টপুষ্ট বাছুরকেই পোষ মানায়। এদের কারও কারও পিঠে ছোট কুঁজ। কুঁজ থাকলে মাংস বেশি হবে। মানুষ তখন কুঁজওয়ালা বাছুরদের বেছে বেছে পোষ মানাতে শুরু করে। খাবারদাবার দিতে শুরু করে। এদের কুঁজ তখন আরও বড় হয়। একদিন মানুষ দেখল, এই কুঁজওয়ালা জন্তুদের আর সকলের চেয়ে সহজে পোষ মানানো যায়।

গাভী আমাদের দুধ দেয়। মানুষ একসময় শিকারের ভাবনা ছেড়ে দিল। দলে দলে পশুদের চারণভূমিতে নিয়ে গেল। এভাবে কুঁজওয়ালা গরুদের পেয়েছ তোমরা। নন্দীকে পেয়েছ।'

রাম : 'ঠিক কথা। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়েছে। কিন্তু শস্য কী করে এল?'

সিদ্ধিগাছ : 'অনেককাল আগে, খিদের সময় মানুষকে আমি গাছপালা ঘাস খেতে দেখেছি। চারপাশে কোন কিছু নেই। ধীরে ধীরে মানুষ মোটা ঘাসের বীজ জোগাড় করে। সব ঘাস একরকম হয় না। মাটি নরম হলে খুঁড়ে হয়তো মিঠে আলু, রাঙা আলু তুললে। পরের বছর দেখা গেল, ওই জায়গাটায় খুব ভালো ঘাস

জন্মেছে। মানুষ তখন মাটিতে গর্ত খুঁড়ে মোটা ঘাসের বীজ ফেলতে শুরু করে। পরের বছরের জন্য সবচেয়ে ভাল বীজগুলো রেখে দেয়।'

রাম : 'আমরা তো এভাবে শস্য ফলাই না। আমরা জমিতে লাঙল দিই। মানুষ কীভাবে লাঙল চালাতে শিখল?'

সিদ্ধিগাছ : অনেককাল সময় লেগেছে। প্রথম দিকে মানুষ লাঠি দিয়ে মাটিতে আঁচড় কেটেছে। এতে খুব কাজ দেয়নি। কাঁচা শস্যদানা খেতে ভালো লাগে না। মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছে। দাবানল দেখে আগেকার মানুষ ভয় পেত। বনে আগুন দেখলে পশুদের মতো মানুষও ছুটে পালাত। তারপর একদিন মানুষ রাঁধতে শিখল। আগুনে পুড়িয়ে মাটির পাথর তৈরি করতে শিখল। লাঙল দিয়ে জমি চাষ করতে হলে গায়ে জোর আছে এমন কাউকে চাই। গরু দিয়ে এই কাজ ভালোই এগোল। এইভাবে মানুষ ভাল ফসল পেল। মানুষের চাষের কাজ এদের না হলে চলবে না। কাজেই খাবার হিসেবে মানুষ এদের এখন বেশি মারছে না। এমনটা না হলে নন্দীর মতো শক্তপোক্ত ষাঁড় তুমি পেতে না।'

রাম : 'নন্দীকে মারবে কেউ? কার এমন বুদ্ধিনাশ হয়েছে? সে যাগগে। তুমি বলেছিলে, মানুষ মানুষকে তৈরি করেছে। আমার তো মনে হয়, দেবতা মানুষ তৈরি করেছেন।'

'মানতেই হবে, নন্দীকে কেউ হুল ফুটিয়েছে'

সিদ্ধিগাছ : 'আমি খানিকটা আগে বললাম, আগুনের প্রতি মানুষের ভয় একটু একটু করে কমেছে। আগুনকে একসময় মানুষ দেবতা ভেবে পুজোও করেছে। কিছুদিন পর মানুষ নিজেই আগুন জ্বালাতে শিখল। দুটো পাথরের টুকরো ঘষলে আগুন পাওয়া যায়। তারপর মানুষ আমাকে আর নন্দীকে পুজো করতে শুরু করল। আমরা মানুষকে আহার দিই। আমার ফল এখনও মানুষের খেতে ভাল লাগে। ডুমুর আকারে বড়। বেশি মিষ্টি। আমার ফলের চেয়ে ডুমুরকে মানুষ বেশি পছন্দ করে। ডুমুর গাছ বড় হয় না বেশি। সবল হয় না। ভাল মাটি না হলে ডুমুরগাছ জন্মায় না। জল চাই প্রচুর। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে দিতে হয়। আমি তো এমনি এমনি জন্মাই। দাবানলে বারবার আমার নিকট পরিজনেরা পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি শেষ হইনি। আবার জন্মেছি। এখনও মানুষ আগুন পুজো করে। আমাকে পুজো করে। নন্দীকেও করে। কিন্তু আগের মতো করে না। আমি বলছি তোমায়, আমরা মানুষ তৈরি করিনি।'

রাম : 'তা হলে কে তৈরি করেছে?'

সিদ্ধিগাছ : 'মানুষ নিজেরা নিজেদের তৈরি করেছে। একেবারে শুরুতে মানুষ ছোট্ট মিষ্টি ছিল, বানরবন্ধুর মতো। কিন্তু অসহায় ছিল। আগুন আবিষ্কারের পর মানুষ ধাতুকে কাজে লাগায়। প্রথমে তামা ও পরে লোহা কাজে লাগায়। এর আগে পাথরের যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে মানুষ। শিকারের জন্য তিরধনুক তৈরি করেছে। খাবার জমিয়ে রাখবে বলে ঝুড়ি ও চামড়ার ব্যাগ তৈরি করেছে। মাছ ধরার জাল তৈরি করেছে। এভাবে খাবারের পরিমাণ বাড়িয়েছে। গা-গতর খাটিয়ে চাষবাস করেছে। নিজেদের জোর বেড়েছে। মাথায় ভারী মোট বইছে মানুষ। তাই সোজা হয়ে চলতে শিখেছে। বাড়িঘর তৈরি করেছে মানুষ। পোশাক তৈরি করেছে। অনেক কাল আগে বয়স্ক মানুষেরাও পোশাকহীনভাবে আমার ছায়ায় দিন কাটিয়েছে। তোমার মতো। তুমি যখন ছোট ছিলে, তেমনভাবে।'

রাম : 'গরমকালে আমিও খুব বেশি কাপড় জামা পছন্দ করি না। মা খালি গায়ে থাকতে বারণ করেন, তাই। আচ্ছা, আমাকে আরও একটা জিনিস বল তো। দেবতারা কখন এসেছেন?'

সিদ্ধিগাছ : 'মানুষ দেখতে পেল, চারদিকে অনেক জিনিস। সে তখন তার নিজের প্রয়োজনে নানা জিনিস জোগাড় করল। সে ভাবল, এই ধরণীমাতা তাকে

সব জিনিস দিয়েছেন। আমরা তো এখনও বলি, 'পৃথিবী আমাদের জননী'। মানুষ তারপর ওইসব জিনিস কাজে লাগিয়ে নিজেরাই আরও নতুন জিনিস তৈরি করতে শিখল। সে একসময় ভাবল, 'আমাকেও নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তৈরি করেছে'। আমি ভাল জানি, তোমাদের যত দেবতা আছে, সকলের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আমি দেখেছি, মানুষ নিজেদের কী করে তৈরি করেছে। তবে মানুষকে আরও অনেকদূর যেতে হবে। কখনও কখনও সে অন্য মানুষের প্রতি বড্ড বেশি নিষ্ঠুরতা দেখায়।'

সন্ধে হয়ে আসছিল। রামের মা এক ঝুড়ি লাল ফুল নিয়ে এলেন। ঝরনার ধারে ঝুড়িটা নামিয়ে রাখলেন। সিদ্ধিগাছকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন। রামের বন্ধুরা সব একে একে নিঃশব্দে ফিরে গেল। মা বললেন, 'রাম, এদিকে আয়। তৈরি হ'। আজ রাত্তিরে যে মিছিল হবে, নন্দী সবার সামনে থাকবে। তুই তো জানিস, নন্দী সকলের আগে এসেছে। আয়, তাকে বাড়ি নিয়ে যাই। ভাল করে সাজাই।'

# ডি ডি কোসাম্বির রচনাপঞ্জি

## বই

*An Introduction to the Study of Indian History* (Popular Book Depot, Bombay), 1956.

*Exasperating Essays : Exercises in the Dialectical Method* (People's Publishing House, New Delhi), 1957.

*Myth and Reality : Studies in the Formation of Indian Culture* (Popular Prakashan, Bombay), 1962.

*The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline* (Routledge & Kegan Paul, London),1965.

*D. D Kosambi : Combined Methods in Indology and Other Writings* - Compiled, edited and introduced by Brajadulal Chattopadhyaya (Oxford University Press, New Delhi), 2002.

## সম্পাদিত বই

*The Satakatrayam of Bhartrhari with the comm of Ramarsi,* edited in collaboration with Pt. K. V. Krishnamoorthi Sharma (Anandasrama Sanskrit Series, No. 127, Poona), 1945.

*The Southern Archetype of Epigrams Ascribed to Bhartrhari* (Bharatiya Vidya Series 9, Bombay) First critical edition of a Bhartrhari recension, 1946

*The Epigrams Attributed to Bhartrhari* (Singhi Jain Series 23, Bombay) Comprehensive edition of the poet's work remarkable for rigorous standards of text criticism, 1948.

*The Cintamani-saranika of Dasabala ;* Supplement to *Journal of Oriental Research,* xix, pt, II (Madras) (A Sanskrit astronomical work which shows that King Bhoja of Dhara died in 1055-56, 1952.

*The Subhasitaratanakosa of Vidyakara,* edited in

collaboration with V. V. Gokhale (Harvard Oriental Series 42), 1957

*গণিত বিষয়ক*

"Precessions of an Elliptical Orbit", *The Indian Journal of Physics,* v, pt. III (1930), 359-64.

"On a Generalization of the Second Therem of Bourdbaki", *Proceedings of the Academy of Sciences,* UP, I (1931) (3 pages)

"Modern Differential Geometries", *The Indian Journal of Physics.* vii, pt. II (1932), 159-64.

"On the existence of a Metric and the Inverse Variational Problem", *Proceedings of the Academy of Sciences. UP, ii (1932), 17-28.*

"Geometrie Differenticale et Calcul des Variations". *Rendiconti della R. Accademia Nazionale Dei Lincei.* xvi, Series 6 (1932), 410-15.

'On Differential Equations with the Group Property", *Journal of the Indian Mathematical Society.* xix (1932), 215-19.

"Affin-geometrische Grundlagen der Einheitlichen Feld-theorie", *Sitzungsberichten der Preuss B. Akademic der Wissenschaften, Physikalisch-mathematische Klasse,* xxviii *(1932), 342-45.*

"The Classification of Integers", *Journal of the University of Bombay.* ii, pt. ii (1933), 18-20.

"The Problem of differential Invariants", *Jounrnal of the Indian Mathematical Society,* xx, (1933), 185-88.

"Parallelism and Path-spaces", *Mathematische Zeitschrift,* xxxvii (1933), 608-18.

"Collineations in path-space", *Journal of the Indian Mathematical Society,* i (1934), 68-72.

"Continuous Groups and Two Theorems of Euler", *The*

*Mathematics Student,* ii (1934), 94-100.

"The Maximum Modulus Theorem", *Journal of the University of Bombay,* iii, pt. ii (1934), 11-12.

"Systems of Differential Equations of the Second Order", *The Quarterly Journal of Mathematics,* vi (Oxford, 1935), 1-12.

"Homogeneous Metrics", *Proceedings of the Indian Academy of Sciences,* i (A : 12) (1935), 952-54.

"An Affine Calculus of Variations", Ibid. ii (1935), 333-35.

"Differential Geometry of the Laplace Equation", *Journal of the Indian Mathematical Society,* ii (1936), 141-43.

"Path-spaces of Higher Order", *The Quarterly Journal of Mathematics,* vii (Oxford, 1936), 97-104.

*"Path-geometry and Cosmogony"*, Ibid. pp. 290-293.

"Les metriques homogenes dans les expaces cosmogoniques", *Comptes Rendus,* ccvi (Paris, 1938), 1086-88.

"Les espaces des paths generalises qu'on peut associer avec un espace de Finsler", Ibid. pp. 1538-41.

"The Tensor Analysis of Partial Differential Equations", *Journal of the Indian Mathematical Society.* iii (1939), 249-53.

"Path-equations admitting the Lorentz (Group-I)", *Journal of the London Mathematical Society,* xv (1940), 86-91.

"The Concept of Isotropy in Generalized Path-spaces", *Journal of Indian Mathematical Society,* iv (1940), 80-88. 31"

"A Note on Frequency Distribution in Series", *The Mathematics Student,* viii (1940), 151-55.

"Correlation and Time Series", Ibid. pp. 372-74, 35.

"Path-equations Admitting the Lorentz (Group-II)", *Journal of the Indian Mathematical society,* v (1941), 62-72.

"Zeros and Closure of Orthogonal Functions", *Journol of the*

*Indian Mathematical Society,* vi (1942), 16-24.

"Statistics in Function Space", *Journal of the Indian Mathematical Society,* vii (1943), 76-88.

"The Geometric Method in Mathematical Statistics", *American Mathematical Monthly ii (1944), 382-89.*

"Parallelism in the Tensor Analysis of Partial Differential Equations", *Bulletin of the Americal Mathematical Society,* ti (1945), 239-96.

"Sur la Differentiation covariante", *Comptes Rendus,* ccxxii (Paris, 1946), 211-13).

"Les Invariants Differentiels d'un Tenseur Covariant a deux Indices", *comptes Rendus,* ccxxv (Paris, 1947), 790-92.

"Systems of Partial Differential Equations of the Second Order" *Quarterly Journal of Mathematics,* xix (Oxford, 1948)204-19.

"Lie Rings in Path-space", *proceedings of the National Academy of Science,* USA, xxxv (1949), 271-77.

"Lie Rings in Path-space", *proceedings of the National Academy of Science,* USA, xxxv (1949), 389-94.

"Diffenential Invariants of a two-index Tensor", *Bulletin of the American Mathematical Society.* Iv, no. 2 (1949), 90-94.

"Series Expansions of Continuous Groups", *Quarterly Journal of Mathematics,* ii, no.2 (Oxford, 1951), 244-57.

"Path-spaces Admitting Collineations", *Quaterly Journal of Mathematics.* ii, no.3 (Oxford, 1952), 1-11.

"Path-Geometry and Continuous Groups", *Quarterly Journal of Mathematics,* ii, no.3 (Oxford, 1952), 307-20.

"The Metric in Path-space", *Tensor,* New Series, iii (1954), 67-74.

"The Sampling Distribution of Primes", *Proceedings of the National Academy of Sciences* (USA), xlix (1963), 20-23.

*সমাজ ইতিহাস ও অন্যান্য*

"A Note of the Trial of Sokrates", *Fergusson College Magazine* (1939), pp. 1-6 (Sokrates and the class war of his day) ; Reprinted in *Exasperating Essays.*

"The Emergence of National Characteristics among Three Indo-European Peoples", *Annals of the* Bhandarkar Oriental Research Institute, *xx, pt. ii (Poona, 1940), 195-206. (trial speculation on Indology.)*

*(a)* "The Function of Leadership in a Mass Movement" ;

*(b) "The Cawnpore Road", Fergusson college Magazine (1939-40),* pp. 1-7 (A critique of dialecticalmaterialistic social theory ; a story published under the pseudonym "Ahriman"); Reprinted in *Exasperating Essays.*

(a) "Revolution and the Progress of Science", *New Age,* v, 320-25. (A survey of the effects of the Revolution, upon Mathematics in the USSR ),

(b) "Science Learns the Goose-step", Ibid. pages unknown, as the Journal was suppressed soon after

"A Statistical Study of the Weights of the Old Indian Punch-marked coins", *Current Science,* ix (1940), 312-14.

"A Note on Two Hoards of Punch-marked Coins Found at Taxila", *New Indian Antiquary,* iii (1940), 156-57.

"On the Study and Metrology of Silver Punch-marked Coins", *New Indian Antiquary,* iv (1941), 1-35 and 49-76 (Numismatics as a science, with an application to its most difficult problem) ; (b) Additions and Corrections, Ibid. v (1942).

"The Quality of Renunciation in Bhartihari's Poetry". *Fergusson college Magazine* (1946), pp. 49-62. Reprinted in *Exasperating Essays.*

"On the Origin and Development of Silver Coinage in India",

*Current Science,* x (1941), 395-400.

(Shows that the punch-marked coinage system developed from Mohenjodaro cut silver pieces.)

"On Valid Tests of Linguistic Hypotheses", *New Indian Antiquary.* v (1942), 21-24.

"The Effect of Circulation upon the Weight of Metallic Currency", *Current Science,* xi (1942), 227-31.

"A Test of Significance for Multiple Observations", Ibid. pp. 271-74.

"Progress in the Production and consumption of Textile Goods in India", *Journal of Indian Merchants' Chamber* (Bombay, 1943), pp. 11-15. Published as by "Vidyarthi" and Miss Sushila Gokhale.

"Race and Immunity in India", *New Indian Antiquary,* vi (1943), 29-33.

"Soviet Victory and the World Revolution", *Indo-Soviet Journal,* ii (7 November 1943), 6, (Shows that the theory of world revolution had not been abandoned by the USSR, as of that date.)

"The Estimation of Map Distance from Recombination Values", *Annals of Eugenics,* xii. pt. III (1944), 172-75.

"George David Birkhoff : 1884-1944" (Obituary), *The Mathematics Student,* xii (1944), 116-20.

"Direct Derivation of Series, Spectra", *Current Science,* xiii (March 1944), 71.

*"The Change in the Soviet constitution", Indo-Soviet Journal,* ii, no. 9 (1944).

"Caste and Oass in India", *Science and Society,* viii (1944), 243-49. Comment on an article by P. Rosas on the subject.).

"Soviet Science : What Can It Teach Us?", *Indo-Soviet Journal,* 11-13 (22 June 1944).

"The Raman Effect" (Anonymous, as by an "Indian Scientist"), *People's Age* (22 July 1945).

"Some Extant Versions of Bharatihari's Satakas", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxi (1945), 17-32.

"The Law of Large Numbers", *The mathematics Student,* xiv (1946), 14-19.

"The *Parvhasamgraha* of the *Mahabharata", Journal of the American Oriental Society",* Lxvi, no.2 (Baltimore, 1946), 110-17 ; followed by the counts of E. D. Kulkarni, Ibid. 118-44. (First complete discussion of the problem and of V. S. Sukthankar's concept of a "fluid text".)

"On the Authorship of the *Satakatrayi", Journal of Oriental Research,* xv (Madras, 1946), 64-77.

"Silver Punch-marked coins with special reference to the East Khandesh Hoard", *Journal of the Numismatic Society of India,* viii (1946), 63-66.

"Early Stages of the Caste System in Northern India", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, New Series, xxii (1946), 33-48.*

"The Village Community in the 'Old Conquests' of Goa", *Journal of the University of Bombay,* xv, no.4 (1947), 63-78.

An Extension of the Last-squares Mehtod of Statistical Estimation", *Annals of* Eugenics, xiii (1947), 257-61.

"Some Applications of the Functional Calculus", Presidential Address to the Mathematics Section of the Indian Science Congress (Delhi, 1947). (Completely ruined in printing, no proof shown to the author.)

"Early Brahmins and Brahminsim", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxiii (1947), 39-46.

"Chronological Order of Punch-marked Coins- I : A Re-examination of the Older Taxila Hoard", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxiv, : xxv (1948-49), 33-47.

"The Avatara Syncretism and Possible Sources of the *Bhagvad-Gita",* Third. pp. 121-34.

"Characteristic Properties of Series Distributions", *Proceedings of the National Institute of Science of India.* xv (1949), 109-13.

"On the Origin of Brahmin Gotras", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxvi (1950), 21-80.

"Chronological Order of Punch-marked Coins-II : the Bodenayakanur Hoard", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxvi (1951), 214-18.

"Urvasi and Puniravas", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxvii (1951), 1-30. Reprinted in *Indian Studies : Past & Present,* i, no. 1(Calcutta, 1959), 141-75, and in *Myth and Reality.*

"On a Marxist Approach to Indian Chronology", *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute,* xxxi (Poona, 1951), 258-66.

"Seasonal Variations in the Indian Birth-rate" (in collaboration with S. Raghavachari) *Annals of Eugenics,* xvi (1951), 165-92.

"Imperialism and Peace", *Monthly Review,* iii (1951), 45-49.

*"Parvasamgraha figures* for the *Bhisma Parvan"* (in collaboration with E. D. Kulkarni), *Journal of the American Oriental Society,* lxxi (Baltimore, 1951), 21-25.

"The Sanskrit Equivalents of Two Pali Words", *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Jnst:tute,* xxxii (Poona, 1952), 53-60 (Gives the Correct derivation of *Sammapaso* and

*vassakara.)*

"Ancient Kosala and Magadha", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxvii (1952), 180-213.

"Science and Freedom", *Monthly Review,* iv (1952), 200-05.

"Geldner's *Rgveda", Journal of Oriental Research* (Madras, 1952), pp. 291-95 (Essay review with special attention to words like *ibbya).*

"Chronological Order of Punch-marked Coins-III: The Paila Hoard", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxvii (1952), 261-71.

"Brahmin Clans", *Journal of the American Oriental Society,* lxxiii (Baltimore, 1953), 202-8. Review and critique of J. Brough's book, *The Early Brahmanical System of Gotra and Pravara.* Cambridge, 1953. Mistaken for a polemic.)

"Seasonal Variations in the Indian Death-rate" (in collaboration with S. Raghavachari), *Annals of Human genetics.* xix (1954), 100-19.

*"The Periodization of Indian History", ISCUS,* i (1954), 40-55. (Arbitrarily changed by the editors, without consulting the author.)

"Notes on the Class Structure of India", *Monthly Review,* vi (1954), 205-13. Reprinted in *Exasperating Essays.*

"What Constitutes Indian History?", *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute,* xxxv (Poona., 1955), 194-201. (Essay review of the first three volumes of the Bhartiya Vidya. Bhavan's *The History and Culture of the Indian People.)*

"The Basis of Ancient Indian History-I", *Journal of the American Oriental Society,* lxxv, no.1 (Baltimore, 1955), 35-45.

"The Basis of Ancient Indian History-II", Ibid. no.4 (1955), 226-37

"The Working Class in the *Imarakosa, Journal of Oriental Research.* xxiv (Madras, 1955), 57-69. (Shows the existence of a hierarchical principle in the *Amarakosa* classification).

"On the Development of Feudalism in India", *Annals of* the *Bhandarkar Oriental Research Institute,* xxxvi, pts. III-IV (Poona, 1956), 258-69. (Adverse critique of Soviet Professor K. A . Antonova's theories.)

"Origins of Feudalism in Kashmir", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.* (The sardhasatabdi Commemoration Volume, 1804-1954, Bombay, 1956-57), pp. 108-20.

"Dhenukakata", *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* xxx, pt. II (1957), 50-71.

(Identification of the ancient Greek colony in Maharashtra. Also, complete text and translation of all known Brahmi inscriptions in Maval caves, including one from Karle hitherto unpublished. The first photograph of theSphinx on a Karle pillar.)

"The Basis of Despotism", *Economic Weekly* (Bombay, 2 November 1957), pp. 1417-19. (Review of K. A. Wittfogel's *Oriental Despotism.*)

"Indo-Ariiskii Nosovoi Ukazatel", Sovetskaya Etnografia (Ak. Nauk. USSR), no.1 (1958), 29-57. (Demonstrates the unreliability of nasal-index data in theorizing about Indian racial groups.)

"Classical Tauberian Theorems", *Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics x, nos. 1-2 (1958), 141-49.*

*"The Efficiency of Randomization by Card Shuffing" (in collaboration with U.V.R. Rao),* Journal of Royal Statistics Society, *Exxi, no.2 (1958), 223-33. (Analysis of statistical defects underlying parapsychological experiments.)*

"The Text of the Arthashstra". *Journal of the American*

Oriental Society, lxxviii, no.3 (Baltimore, 1958), 169-73.
(Shows that about a quarter of the original works is lost, but more or less uniformly over the whole text.)

"The Method of Least Squares", *Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics,* xi, nos. 1-2 (1959), 49-57.

"Notes on the Kandahar Edict of Asoka", *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* ii (Leiden, 1959), 204-06.

"China's Communes", *Monthly Review,* x (1959), 425-29, 109.

"Primitive Communim", *New Age* (Monthly) viii, no.2 (February 1959), 26-39. (First treatment of "Communism" in primitive society, without idealisation of ethnographic data.)

"Indian Feudal Trade Charter", *Journal of the Economic and Social History of the Orient,* ii. pt. III (Leiden, 1959), 281-93. (Special treatment of the Visnusena Charter of A.D. 592, correcting D. C. Sircar's gruesome mistakes.)

"An the Application of Stochastic convergence", *Journal of the Indial Society of Agricultural Statistics,* xi (1959), 58-72.

"At Cross-roads : Mother goddess cult sites in Ancient India", *Journal of the Royal Asiatic Society* (London, 1960), 17-31; 135-44.

"Social and Economic Aspects of the *Bhagvad-Gita*". *Journal of the Economic and Social History of the Orient.* iv, pt. II (Leiden, 1961), 198-224. (Revision of an anticle originally published in *Enquiry,* ii (1959), 1-20. Reprinted in *Myth and Reality.)*

"Kaniska and the Saka Era", *Marg* (April 1962); also *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.* xxxv

(1962), 36-37, (Identifies Kaniska I with Soter Megas and Kaniska II with the king of the coins.)

"Pierced Microliths from the Western Deccan Plateau", *MAN* (May 1962), nQte 4, pp. 10-12. (Aparently the first announcement of such microliths.)

Megaliths in the Poona District", *MAN* (January 1962), note 108, pp. 65-67+plate.

"Combined methods in Indology", *Indo-Iranian Journal.* vi (1963), 177-202. (By special invitation of the editors ; shows that philology, history, archaeology, and anthropology have to be combined to get valid results in any one of these fields, which treated in isolation, leads to wrong conclusions otherwise.)

"Prehistoric Rock Engravings near Poona". *MAN* (1963), note 60, pp. 57-58.

"Staple Grains' in the Western Deccan", Man (1963), note 60, pp. 57-58.

"The Beginning of the Iron Age in India", *Journal of the Economic and Social History of the Orient. vi. pt. III (Leiden, 1963), 309-18 (Places this imporatant change at about 800-700 B.C. much earlier than D. H. Gordon and Mortimer Wheeler would have it.)*

*"The Autochtonous Element in the* Mahabharata'Journal of the American Oriental Society. 1x.xxiv (Baltimore, 1964), 31-44.

"The Historical Krishna", *Times of India Annual* (1965), pp. 27-36.

"Scientific Numismatics", *Scientific Amcriucn* (February 1966), pp. 102-11.

"Living Prehistory in India", Ibid. (February 1967). Re-. printed in *the American Review* (October 1967).

"Adventure into the Unknown", *Current Trends in Indian Philosopy.* ed. K. S. Murty and K. R. Rao (Asia Publishing House, Bombay, 1972), pp.152-67. A note on the writer's personal philosophy as a scientist and research worker.)

"Prime Numbder', Monograph Completed a few days before the author's death.

*বাংলা বই/পত্রিকা*

ভারত-ইতিহাস চর্চার ভূমিকা (An Introduction to the Study of Indian History-র অনুবাদ) ঃ অনুবাদক - গৌতম মিত্র, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০২।

দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিতর্কিত প্রবন্ধগুচ্ছ (Exasperating Essays : Exercise in the Dialectical Materialism-র অনুবাদ) অনুবাদক -দ্বিজেন গুপ্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০০৩।

এবং মুশায়েরা : দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি সংখ্যা, ভল্যুম-১৪ নং-৩/৪, সম্পাদক : সুবল সামন্ত, ২০০৮

# জীবনপঞ্জি

জন্ম — জুলাই ৩১, ১৯০৭, কসবেন, গোয়া।

পরিবার — দাদু দামোদর শেনয়। বাবা ধর্মানন্দ দামোদর কোসাম্বি। মা বালাবাঈ। তিন বোন। মানিক, মনোরমা, কমলা।

লেখাপড়া — ১৯১৮ : নিউ ইংলিশ স্কুল, পুনে।

১৯১৮-১৯২৫ : কেমব্রিজ গ্রামার স্কুল ও লাতিন হাইস্কুল, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেট্‌স্, আমেরিকা।

১৯২৫-১৯২৯ : হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন। 'ফাই-বিটা-কাপ্পা' সদস্যপদ লাভ।

১৯২৯-১৯৩১ : অধ্যাপনা, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৩০ : প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ। গবেষণাপত্রের শিরোনাম 'Precessions of an Elliptical Orbit', ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্‌স্-এ প্রকাশিত।

৭ই মে, ১৯৩১ : নলিনী মাদগাওকারের সঙ্গে বিবাহ।

১৯৩১-১৯৩২ : অধ্যাপনা, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৩২ : ফরাসি ও জার্মান ভাষায় গবেষণাপত্র প্রকাশ।

১৯৩৩ : ফার্গুসন কলেজে যোগদান, ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন।

১৯৩৪ : রামানুজন পুরস্কার অর্জন। ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা সভ্যপদ লাভ।

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৫ : প্রথম কন্যা মায়ার জন্ম। বর্তমানে সুইডেনবাসী।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৯ : দ্বিতীয় কন্যার জন্ম। মেধাবী ছাত্রী হিসাবে খ্যাতিলাভ।

১৯৪৪-১৯৪৬ : লাইব্রেরিয়ান, ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি।

১৯৪৭ : মুম্বাইয়ে 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল *রিসার্চ*'-এর গণিত বিভাগে যোগদান।

১৯৫৬ : প্রকাশিত প্রথম বই — Introduction to the Study of Indian History, Popular Book Depot, Bombay.

১৯৫৭ : প্রকাশিত দ্বিতীয় বই — Exasperating Essays, People's Book House, Poona.

১৯৬০ : পৌত্রী নন্দিতার জন্ম।

১৯৬২ : প্রকাশিত তৃতীয় বই — Myth and Reality : Studies in the Formation of Indian Culture, Popular Prakashan, Bombay.

১৯৬২ : 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ' থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৬৫ : প্রকাশিত চতুর্থ বই — The Culture and Civilization of Ancient India in Historical Outline, Routledge & Kegan Paul, London.

১৯৬৫ : সি. এস. আই. আর. কর্তৃক 'এমিরেটাস সায়েন্টিস্টস্' নির্বাচিত।

২৯শে জুন, ১৯৬৬ : নিদ্রাকালীন অবস্থায় জীবনাবসান।

জ্ঞান বিচিত্রা
JNAN BICHITRA

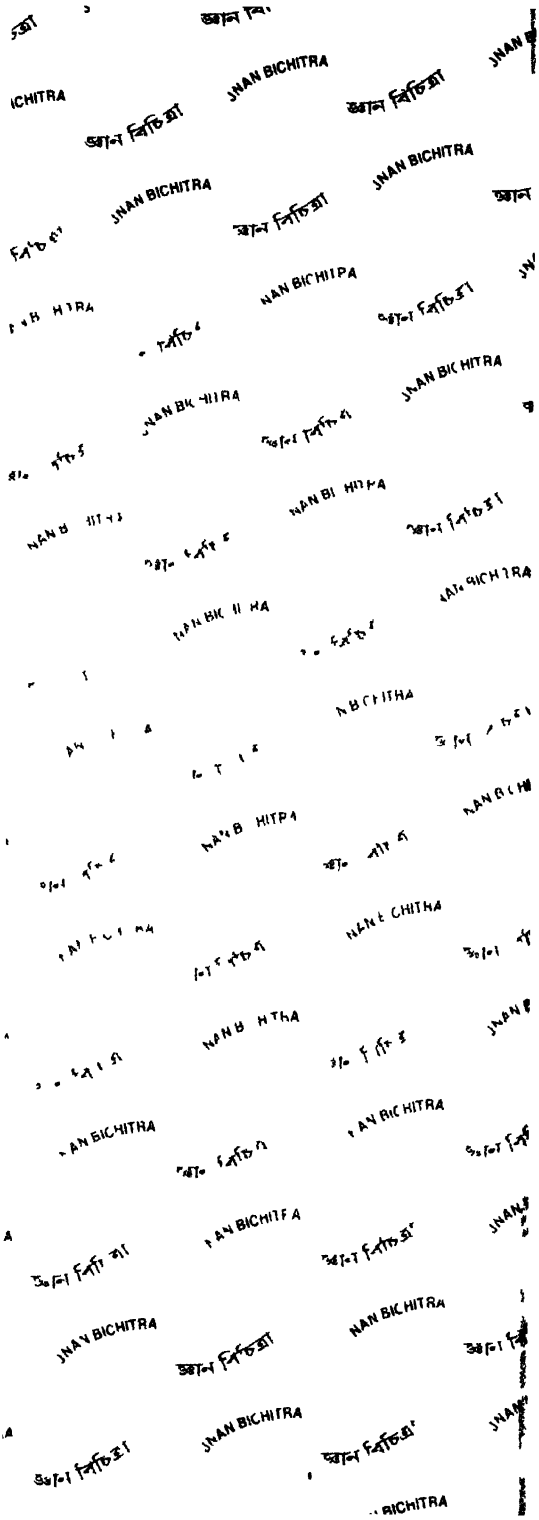

জন্ম ১৯৫৭। উদযপুব বমেশ স্কুল, মহাবাজা বীববিক্রম কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযে পডাশুনো কবেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিবে গবেষণা। সেন্ট জেভিযার্স কলেজেব বসাযন বিভাগে অধ্যাপনা দিযে কমজীবনেব শুরু। বাইবেব দেশে কিছুকাল উচ্চতব গবেষণা। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বসাযন বিভাগে অধ্যাপনা কবেন। বহু জনপ্রিয বিজ্ঞান গ্রন্থেব বচযিতা। বইযেব সংখ্যা একশোব কাছাকাছি। ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সবকাবেব সত্যেন্দ্রনাথ পুবস্কাবে সম্মানিত। 'সাযেন্স অ্যাসোসিযেশন অফ বেঙ্গল' ও 'কিশোব জ্ঞান বিজ্ঞান' কর্তৃক দুই ভিন্ন বছবে 'গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য' পুবস্কাবে সম্মানিত। ২০০১ সালে ভাবতীয যুক্তিবাদী সমিতি 'বর্ষসেবা বিজ্ঞান লেখক' হিসেবে সম্মানিত কবেছেন। একাধিক বিজ্ঞান পত্রিকাব সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত বযেছেন। লেখক বিজ্ঞান জনপ্রিযকবণ আন্দোলনে দীর্ঘকাল যুক্ত।

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বি। ১৯০৭ সালে জন্ম। ছোটোবেলায় কয়েকবছর এদেশের স্কুলে পড়েছিলেন। তারপর বাবার সঙ্গে আমেরিকায় চলে যান। ওখানকার স্কুল ও পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন। দেশে ফিরে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, পুনের বিখ্যাত ফার্গুসন কলেজ ও টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। বহুমুখী প্রতিভার এক ব্যক্তিত্ব তিনি। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক। গণিতশাস্ত্রের বিশিষ্ট গবেষক। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের অগ্রণী চরিত্র। তাঁর সকল রচনা আজও পাঠক সমাজে সুলভ নয়। জন্মশতবর্ষে কোসাম্বির জীবন ও কাজ নিয়ে আমাদের বিনীত উপহার এই বই।

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
ISBN 978-81-8266-138-7